কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা,
ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ক মুক্তি কোহত্র বা সুখম।"

যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বর তত্ত্ব না জানিতে পারে ততদিন তাহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়, এ অবস্থায় তাহাদের মুক্তি কোথায়, আর সুখই বা কোথায় ?

অষ্টম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩২৩ | ষষ্ঠ সংখ্যা

সঙ্গীত

—:০:—

(কীর্ত্তনাংশ)

"মা-ই সব ; "মা-ই সব," এই আমাদের মাতৃস্তব,
জানিনা আর সাধন ভজন।
মার ইচ্ছাতে জন্মিয়াছি, মার ইচ্ছাতে বেঁচে আছি,
মার ইচ্ছাই সবার জীবন।
(সৃষ্টি থাকেনা, থাকেনা, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বিনা)
স্বর্গে যোগী ঋষিগণ, ঈশা মুসা মহাজন,
শ্রীগৌরাঙ্গ আদি করি সবে ;
ইচ্ছাময়ী মার গুণে, নিত্য নূতন বিধানে
ভাসিছেন সেই ইচ্ছা প্রভাবে।
(আর গতি নাই, গতি নাই,—অনন্ত-জীবন পথে)
যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, পৃথিবীতে বড় ধর্ম্ম,
স্বর্গে নাই প্রবেশাধিকার ;
মায়ের ইচ্ছা পালন, বলিছেন দেবনন্দন,

জীবনের বিকাশ

জীবন বলিতে কি বুঝি? এই যে ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত পঞ্চভূতাত্মক দেহ, যাহার উৎপত্তি দেশকালে, স্থিতি দেশকালে, ইহাকেই কি জীবন মনে করা যায়? দেহাত্ম-বুদ্ধি জীব জন্ম মৃত্যুর মধ্যে যে জীবনের বিকাশ দেখিতে পায়, তাহাকেই জীবন বলিয়া মনে করে। তদতীত জীবনের সম্পর্কে তাহাদের চিন্তা বা ধারণা ক্ষীণ অস্পষ্ট। তাহারা মনে করে, পৃথিবীতে ধন, জন, সম্পদ, সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিবার জন্যই ইন্দ্রিয়াদি। সুতরাং ভোগবাসনায় উন্মত্ত মোহবদ্ধ জীবের ধারণা অদৃশ্য কোন সত্যকে লক্ষ্য করিতে পারে না। দেশকাল পরিচ্ছিন্ন গণ্ডীর বাহিরে জীবনের গতিস্থিতি আকাশকুসুমবৎ কল্পনা বা জল্পনা মাত্রই মনে হয়। কিন্তু পৃথিবীর ধূলি মাটীর অনিত্য জীবনই যদি সত্য জীবন হয়, তবে জীবনের মর্য্যাদা ও গৌরব কি? তবে এ জীবন কে প্রার্থনা করিবে? প্রাণতো নিত্য জিনিষ চায়। আজ যাহা আছে কাল যদি তাহা না থাকে, তবে বাস্তব প্রাণতো তাহা পাইবার জন্য লালায়িত হয় না। জীবনের একটা নিত্যত্ব-নিগূঢ় ভাব আছে বলিয়াই, জীবন তাহা স্বতই ইচ্ছা করে। তবে সে নিত্য জীবন কি, যাহা দেশকালে বদ্ধ নহে, ভোগসুখে রত নহে, জন্ম মৃত্যুর মধ্যে সসীম নহে, কিন্তু তাহা নিত্য মুক্ত, নিত্য বর্দ্ধিত, নিত্য পরিস্ফুট, নিত্য নবজীবনে সঞ্জীবিত। সে জীবন ব্রহ্মসন্তান জীবন, অনন্ত করুণাময়ী জননীর সরল শিশুজীবন, সে জীবন মায়ের প্রেম পুণ্য বিশ্বাস ভক্তিতে উন্নতিশীল জীবন, সে জীবন অখণ্ড পরিবারবদ্ধ জীবন, সে জীবন শ্রীহরির পদাশ্রিত জীবন এবং তাঁহার ভক্ত বিশ্বাসী প্রেমিক সন্তানগণের দাসানুদাস জীবন, সে জীবন বিশ্বমানবের অঙ্গীভূত জীবন, সে জীবন নিত্য শান্ত, নিত্য কর্ম্মঠ, নিত্য বুদ্ধ।

জীবন সত্য বিকাশশীল—অনন্ত পূর্ণতার দিকে গতি শীল হইলেও মিথ্যাজালে জড়িত হইয়া জীবন বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু এই মিথ্যার ভিতরেও নিয়ত থাকা অসম্ভব। প্রাণ অলক্ষিতে এ সব পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য কাহার সন্ধানে ছুটিয়া যায়। প্রাণের নিত্য যোগ গূঢ়ভাবে যাঁহার সঙ্গে আছে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদিন থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সত্যের সন্ধানে প্রাণ ব্যগ্র হইলেও প্রকৃত সত্যকে ধারণ করিতে প্রকৃত সত্যকে চিনিয়া লইতে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া যায়। জীবনের কত সাধন, কত তপস্যা, কত বৈরাগ্য

কত জপ তপ, কত আত্ম-নিবেদনের পর সত্যকে আত্মস্থ করিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবল্লীতে, ভৃগু বরুণ সংবাদে মনুষ্যজীবনের ব্রহ্মানুসন্ধানের ধারা প্রকৃতরূপে বর্ণিত আছে। তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হইতে পারে।

ভৃগু স্বীয় পিতা বরুণের নিকট বিনীতভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া নিবেদন করিলেন, আমাকে ব্রহ্ম কি বুঝাইয়া দিন। বরুণ তাঁহাকে কহিলেন,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।"

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

পিতার বাক্য গ্রহণপূর্ব্বক ভৃগু গভীর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যথাবিধি চিন্তা, মনন ও সন্ধান করিতে লাগিলেন। যাঁহা হইতে সর্ব্বভূত জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া জীবিত রহে, এবং যাঁহাতে লীন হয়, তিনি কিরূপ? এই ভাবিতে ভাবিতে ভোগকামনাশীল, স্থূলদেহাভিমানী জীবের ন্যায় অন্নের মহিমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। শাস্ত্রাদিতেও অন্নের যথেষ্ট মহিমাবর্ণন দেখিলেন। তখন তিনি বিমূঢ় হইয়া বলিলেন,

"অন্নং ব্রহ্মেতি—অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি-জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" অন্নই ব্রহ্ম, অন্ন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, অন্ন দ্বারা জীবিত রহে, অন্তে এই অন্নেতেই (স্থূল প্রপঞ্চে) প্রবেশ করে।

কিন্তু অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া ভৃগুর কিছুতেই তৃপ্তি হইল না, পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলেন। বরুণ বলিলেন, "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান।

পিতৃবাক্যানুসারে পুনঃ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দ্বারা তিনি প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। এই প্রাণ শব্দ নানা দেহস্থিত জীবনী-শক্তিস্বরূপ প্রাণ-বায়ু সমূহকে প্রতিপন্ন করে। ভৃগু দেখিলেন, এই প্রাণই তো সর্ব্বস্ব। শাস্ত্রাদিতেও প্রাণের স্তুতিবাদ আছে, সমুদয় নিদ্রিত হইলেও প্রাণ জাগ্রত থাকে, চক্ষুরাদি নষ্ট হইলেও প্রাণের সত্তাতে জীবিত থাকা যায়। এইরূপে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন,

"প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

প্রাণ হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, প্রাণ দ্বারা জীবিত থাকে, প্রলয়-কালে প্রাণেতেই প্রবেশ করে। কিন্তু এই জ্ঞানলাভেও ভৃগুর তৃপ্তি হইল না। পুনরায় পিতার নিকট গমন করিলেন। পিতা বলিলেন, "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর।" ভৃগু পুনরায় দৃঢ়ব্রত হইয়া ব্রহ্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন শাস্ত্রে আছে "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" মনই ব্রহ্ম, মনের উপাসনা করিবেক। এই মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি, ইচ্ছা বাসনাদি ইহার অন্তর্গত, ইহা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, বুদ্ধিকে অনুসন্ধান ও নিশ্চয়ে নিয়োজিত করে। এই মনের অধীন হইয়াই জীব বিষয়সুখে আকৃষ্ট হয়, অভি-মানে অন্ধ হয়, শত শত আশায় তরঙ্গাকুলিত হয়। অতএব এই মনই সর্ব্বস্ব। এইরূপে তিনি মনকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন,—

"মনসোহ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

মন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, মনেতে জীবিত রহে, অন্তে মনেতেই লয় হয়। কিন্তু তৃপ্তি পাইলেন না। পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞানপ্রার্থী হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা বলিলেন "তপস্যা কর"। তিনি তপস্যা করিয়া বিজ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। বিজ্ঞান বুদ্ধি শব্দের বাচ্য। অনুসন্ধান, সিদ্ধান্ত, নিশ্চয় প্রভৃতি বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধিই মনের অভ্যন্তর পদার্থ। বুদ্ধিই মনের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করে। বিজ্ঞানই (বুদ্ধি) অন্ন, প্রাণ, মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পদার্থ, অতএব বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। ভৃগু কহিলেন,—

"বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

বিজ্ঞান হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত রহে, প্রলয়কালে বিজ্ঞানেই প্রবেশ করে।

কিন্তু ইহাতেও ভৃগুর তৃপ্তি হইল না। পুনরায় পিতার নিকট গেলেন। পিতা তপস্যা করিতে বলিলেন। এবার তপস্যা দ্বারা জানিতে পারিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দ প্রাকৃতিক জীবানন্দ,—কিন্তু ভূমানন্দ নহে। দেহ (অন্ন), প্রাণ, মন, বুদ্ধি (বিজ্ঞান) এই সকলের অভ্যন্তরে জীবভোগ্য এক আনন্দ আছে। এই আনন্দই শ্রেষ্ঠ বস্তু। অতএব তিনি কহিলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব

খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে : আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।” আনন্দ হইতেই জীবসকল উৎপন্ন হয়, আনন্দ দ্বারাই জীবিত রহে, প্রলয়কালে আনন্দেই গমন করে ও আনন্দেই প্রবেশ করে।

কিন্তু এখানেও ভৃগুর মন তৃপ্ত হইল না। তিনি যখন অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, জীবানন্দ এই পঞ্চকোষ বর্জ্জন করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য আকুল হইলেন, তখন তিনি অপ্রাকৃতিক, সংসারাতীত আনন্দের সাক্ষাৎ সন্ধান পাইয়া বলিলেন,—

“রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।” এই পরমাত্মা রসস্বরূপ, তৃপ্তির হেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়। “যতো বা ইমানি ভূতানি……” এই তটস্থ লক্ষণে স্বাবলম্বযোগে ব্রহ্মনিরূপণে নিরত হইয়া তিনি কুটস্থ স্বরূপ লক্ষণে সর্ব্বাতীত নিরবলম্ব ব্রহ্মকে আত্মার আত্মারূপে পাইয়া শান্ত ও তৃপ্ত হইলেন।

মহামতি ভৃগু চরমে সত্য লাভের যে শ্রেষ্ঠ পথ প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধন। অনন্ত মুক্ত শ্রীভগবান্‌কে মুক্ত হইয়া না খুঁজিলে কে তাঁহাকে পায়? জীবনের বিকাশ তখনই আরম্ভ হয়, যখন এই সত্য ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ ভাবে লাভ করা যায়। সম্পূর্ণরূপে সত্যগ্রস্ত হইলেই জীবনের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ। উপনিষদের ঋষিগণ যে বলিলেন, “সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।” হে সৌম্য, এই যে প্রজা সকল (জীবগণ) ইহাদের মূল সৎ, অর্থাৎ সৎ হইতে উৎপত্তি, সৎ ইহাদের আশ্রয়, সৎ ইহাদের প্রতিষ্ঠা।” তাঁহারা আপনারা সন্মূল, সদায়তন, সৎপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, জীবগণকেও সন্মূল, সদায়তন, সৎপ্রতিষ্ঠ দেখিয়াছিলেন। এই সত্য দৃষ্টি লাভ না করিলে জীবন কিসের উপর দাঁড়াইবে? তিনি সত্য শিব সুন্দর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সে প্রকাশ কিসে? প্রেমে আনন্দে। যতই সত্য উপলব্ধি করা যায়, ততই প্রেম ও আনন্দ জন্মে। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরবলম্ব সত্যকে গ্রহণ করিতে পারিলেই তিনি পুনরায় সমস্ত সত্য করিয়া জীবনের সম্মুখে ধারণ করেন। তখন তাঁহারই প্রেমে সকলকে বুকে ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়, এবং তাঁহারই আনন্দে বিশ্বসংসার মধুময় হইয়া উঠে। উদাসীনের নিকট একটা তৃণ অতি তুচ্ছ, তাহার নিকট তৃণের কোন প্রকাশ নাই, আনন্দ নাই; কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের প্রকাশ আছে, আনন্দ আছে; আবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা তৃণকে দেখিলে, তৃণে সেই প্রকাশ ও

আনন্দ কত পরিপূর্ণ হইয়া আসে। তেমনি আমি মানুষকে ভালবাসিতে পারি না; কেন না তাহার প্রকাশ আমার নিকট ক্ষীণ; কিন্তু সত্যস্থ সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়া দেখিলে সেই মানুষের প্রকাশ কত সত্য। তখন তাহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে পারি, তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারি। শ্রীবুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যুগাবতারগণের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট হইয়াছিল যে, তাঁহারা জীবের চিন্তায়, জীবের উদ্ধারের জন্য রাজ্য, ধন, জন, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। সত্যে জীবনের বিকাশ আরম্ভ, প্রেমে আনন্দে পরিণত হয়, ইঁহাদের জীবনই তাহার সাক্ষী।

জীব সত্যস্থ—ব্রহ্মস্থ হইয়া যখন সংসারে পূর্ণ ব্রহ্মের ইচ্ছা পালনে ইচ্ছা যোগে যুক্ত হয়, তখন সকলই তাহার পরিত্রাণপথের সহায় হয়, কাহাকেও সে ব্রহ্মের ইচ্ছা ব্যতীত পরিত্যাগ করিতে পারে না। তখন পৃথিবীতে যে সব বন্ধনের কারণ ছিল, পাপের অনুকূল ছিল, এখন তাহারা জীবনকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিল। তখন এই ইন্দ্রিয়াদিও তাহার সেবার আয়োজন করে। তখন সত্যই প্রাণ ভক্তসঙ্গে গাহিয়া বলে, "আমার রিপু পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল, অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন।"

জনৈক মুসলমান তাপস তাহার প্রিয় শিষ্যের নবনির্ম্মিত গৃহে পদার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, এই গৃহকে যে দরজা জানালাদি দিয়া নির্ম্মিত করা হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য কি?" শিষ্য বলিল, "গুরুদেব, এই সমস্ত বাতায়নপথে গৃহে রৌদ্র বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিবে, এই জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" গুরুদেব বলিলেন, "ইহা গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য এই, এই সব বাতায়নপথে আজানের ধ্বনি আসিয়া নমাজের জন্য জীবনকে প্রস্তুত করিবে।" বাস্তবিক, আমাদের এই যে ইন্দ্রিয়াদি, প্রকৃতপক্ষে ইহারা চতুর্দ্দিক হইতে ভগবানের মহতত্ত্ব সকল আনয়ন করিয়া জীবনকে প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহারই মহিমা স্তুতিগানে নিয়োজিত করিবে, এই জন্যই প্রেমময় শ্রীভগবানের এই ব্যবস্থা। জীবন সত্যস্থ হইয়া বিকশিত হইতে আরম্ভ করিলে, সমস্তই বিকাশের পথে জীবনকে আরও অগ্রসর করিয়া দেয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার সার এই যে, জীবন সত্য, তাহা নিত্য বিকাশশীল। তাহার আদর্শ দেশকালেবদ্ধ নহে, অনন্ত পূর্ণ শ্রীভগবান্‌ই তাহার লক্ষ্য। দেশকালে তাহার প্রকাশ হইলেও অনন্ত পূর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ না হইলে এই জীবনকে বদ্ধ করে। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্য

শিব সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগযুক্ত হইলে জীবন সত্য হয়, প্রেম পুণ্য আনন্দে জীবন বিকশিত হয়। তখন সমস্ত গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়। সকলের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ হয়, সত্য প্রেম পুণ্যের বন্ধন হয়। দেশ কালের পূর্ণতাও তখন প্রাণ মনকে অনন্ত পূর্ণতার দিকে টানিয়া লইয়া যায়। তখন কোন বাধা আর থাকে না। জীবন সর্ব্বদা উৎসবময় হয়, আনন্দময় হয়। জীবন সত্য, তাহার বিকাশ এই প্রেমে, পুণ্যে আনন্দে পরিণত হয়।

(ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ভাদ্র) শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ।

পঞ্চুদা

(গল্প)

১

পঞ্চুর মাতা যখন মৃত্যুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন করুণ নয়নে শুষ্ক মৃণালের মত শীর্ণহাত দুইখানি তুলিয়া তাঁহার স্নেহের দুলাল একমাত্র পুত্র পঞ্চুকে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া "ওগো তুমি থাকলে এর যেন কষ্ট না হয়" বলিয়া চির-কালের মত নয়নপল্লব নিমীলিত করিলেন, তখন পঞ্চুর বয়স মাত্র চারি বৎসর। পিতা নিবারণ বাবু নিরুদ্ধ-অশ্রুস্রোত বক্ষে চাপিয়া, পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি পুত্রকে নিবিড়ভাবে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রু-সজল নেত্রে পুনঃপুনঃ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। যেন সদ্য শোকাকুলিত বেদনাময় হৃদয়, শিশু-দেহের স্নেহ-স্পর্শে শীতল করিবার আশায় তিনি এইরূপ করিতে লাগিলেন। পঞ্চু তখন শিশু, সংসারের শোক দুঃখে অনভিজ্ঞ, তাহার কোমল প্রাণে সে মোটেই অনুভব করিতে পারিল না যে, তাহার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কিন্তু পিতার ছল ছল করুণ-নয়নের দৃষ্টিতে শিশুর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পিতা যেন তাহার সকল শোক সকল বেদনা মুছাইয়া দিবার জন্য তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। গভীর শোকের প্রথম আবেগ দুরীভূত হইল। কিন্তু নিবারণ বাবু একমাস পর্য্যন্ত কোর্টে যাইতে পারিলেন না। তাঁহার চিত্ত উদাস হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা পুত্রকে কোলে, বুকে লইয়া বাতায়নের নিকটে বসিয়া সর্ব্বদা বাহিরেরদিকে তাকাইয়া থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। পঞ্চু কাঁদিয়া উঠিলে তিনি যেন পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকেন; পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার

চেষ্টা করেন। তাঁহার যেন আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। কেবল পুত্রের সুখ শান্তি ও সান্ত্বনা দেওয়াই যেন তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। মাতৃহারা শিশুর সকল বেদনা দূরীভূত করিতেই তাঁহার মন প্রাণ একান্ত উন্মুখী হইয়া উঠিল।

অনেক সময় দেখা যায় যাহাদের দুঃখ শোকের কারণ একই বিষয়ীভূত, তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহ ও সহানুভূতির সঞ্চার হইয়া থাকে। তাই বুঝি এই সদ্য মাতৃহারা স্নেহবঞ্চিত শিশু ও সদ্য বিরহকাতর পিতৃ-হৃদয় পরস্পরকে একান্ত নির্ভরতা ও সহানুভূতি দিয়া নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া সকল ব্যথা বেদনার অবসান করিতে চাহিতেছিল। নিবারণ বাবু যেন একাধারে তাহার পিতা ও মাতা হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর বিবাহ করিবেন না। তিনি পঞ্চুর জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। কাছারি হইতে আসিয়াই পঞ্চুকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকিতেন। বালকের ন্যায় তাহার সহিত খেলা করিতেন, তাঁহার স্নেহসিক্ত চক্ষু দুইটি সর্ব্বদা তাহারই নিকট পড়িয়া থাকিত, তাঁহার ব্যথিত হৃদয় সর্ব্বদা এই শিশুকে সকল প্রকার ভয় দুঃখ হইতে রক্ষা করিত। তিনি তাঁহার মৃত পত্নীর একমাত্র স্মৃতি এই শিশুকে লইয়াই রক্ষা করিবেন, তিনি আর বিবাহ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন, পঞ্চুর মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও তাহার এক প্রধান কারণ।

২

তারপর চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। নিবারণ বাবু এক বৎসর পর্য্যন্ত পত্নীর শোক ভুলিতে পারিলেন না। কিন্তু কাল আশ্চর্য্য চিকিৎসক। শোক পুরাতন হইলে থাকে না। নিবারণ বাবুরও রহিল না। তিনি মনে করিলেন যে গিয়াছে সে-ত আর ফিরিবে না। স্ত্রী না হইলে সংসার চালানও দুরূহ সুতরাং বিবাহ করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। পঞ্চুও এখন একটু বড় হইয়াছে। যেই সঙ্কল্প অমনি তিনি বিবাহ করিলেন। তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, শোকের প্রথম আঘাতে বুঝি এইরূপই হয়।

যাহা হউক নব পরিণীতা পত্নী সৌদামিনী গৃহে পদার্পণ করিয়া পঞ্চুকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ও সতীনের ছেলে বৈ-ত নয়, আমার সহিত ওর কি সম্বন্ধ? পঞ্চুকে তিনি ক্রমে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার প্রতি নিবারণ বাবুর কতখানি স্নেহ তাহা তিনি জানিতেন। তাই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না, পরে সৌদামিনীর গর্ভে

নিবারণ বাবুর আর একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। তিনি তাহার নাম রাখিলেন 'অরুণকুমার'।

অরুণকুমার তিন বৎসর হইতে না হইতেই পঞ্চুকে 'পঞ্চুদা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। পঞ্চু শৈশবকাল হইতে পিতা ভিন্ন আর কাহারও স্নেহ বা আদর পায় নাই। কাহাকেও তাহার সরল অনাবিল শিশু-হৃদয়ের স্নেহ দিবার সুযোগও হয় নাই। এতদিন পরে সে তাহার এই ছোট ভাইটিকে পাইয়া মনের আনন্দে খেলা করিত। বাগান হইতে ভাল ফুল পাড়িয়া দিত। প্রজাপতি ধরিয়া দিত। অরুণকে আদৌ কাছ ছাড়া করিত না। অরুণ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। কেন না সে—'পঞ্চুদা'র নিকট যতখানি আব্দার করিতে পারে—যতখানি আদর পায়, এমন বুঝি মায়ের নিকটও পায় না। কাজেই পঞ্চু একদণ্ড চোখের আড়াল হইলে পাঁচুদা পাঁচুদা বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইত। বাগানে অরুণকুমার পঞ্চুদার সহিত খেলা করিতেছে—হঠাৎ উচ্চ ডালে একটি সুন্দর ফুল দেখিতে পাইয়া বলিয়া বসিল, 'পঞ্চুদা' ফু'টা', পঞ্চু অমনি ছুটীয়া গিয়া দেখিল তাহাতে হাত পায় না। সে অমনি আকসী প্রস্তুত করিয়া ফুল পাড়িয়া তাহাকে দিল। একটি প্রজাপতি উড়িয়া ফুলে বসিল। অরুণকুমার বলিল "দাদা ঐ পাখী" পঞ্চু অমনি যে কোন উপায়ে গলদঘর্ম্ম হইয়াও সে তাহাকে ধরিয়া দিল। সে নিজের সুখ দুঃখের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিত না। তাহার ছোট ভাইটির আব্দার অভিযোগ শুনিতেই সে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সৌদামিনীর প্রাণে এ সকল ভাল লাগিত না। তাঁহার সংকীর্ণ হৃদয় সর্ব্বদাই ভাবিত ও সতীনের ছেলে ও সর্ব্বদা আমার অমঙ্গল কামনায় নিযুক্ত, ওর কাছে কাছে ছেলেটা সর্ব্বদাই থাকে, ও কখন কি করবে তার ত ঠিক নেই। ছেলেটা আবার এমনি 'জ্যাঠা' যে তারই কাছ না হলে থাকবে না। কেন রে বাপু সে তোর কে—যে তুই তার কাছ না হলে থাকবি না। এই জন্য সৌদামিনী কারণে অকারণে বৃথা অরুণকুমারের গালে দু' একটা ঠোনা মারিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার দিনের অধিকাংশ সময় নভেল পড়িতেই অতিবাহিত হইত। ছেলে সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার নভেল পড়ার ব্যাঘাত জন্মাইবে, তাই আবার ভাবিতেন, বেশই হয়েছে পঞ্চু সতীনের ছেলে হলেও সর্ব্বদা ছেলেটাকে রাখে। আমার বই পড়ার ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

সৌদামিনী এখন নিবারণ বাবুর সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তিনি এখন নিবারণ বাবুর সবদিক অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথম প্রথম স্বামীর নিকট পঞ্চুর

সম্বন্ধে কিছুই বলিতে তাঁহার সাহস হইত না। এখন সামান্য একটু 'ছুতা' পাইলেই সেইটা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত করিয়া কর্ত্তার নিকট সংক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। নিবারণ বাবু সমস্ত শুনিতেন কিন্তু প্রতিবাদ করিতে আর তাঁহার সাহস হইত না। তিনি প্রতিবাদচ্ছলে কখন কিছু বলিলে তাহার যে উত্তর পাইতেন তাহা শ্রবণ করিতে তিনি নিতান্ত গররাজি ছিলেন। সৌদামিনী শেষ এমন পর্য্যন্ত বলিতেন যে, "ডাইনী এমন ছেলে রেখে গেছে, ভাল খাবার না হলে হয় না, মাছের বড় চাকাটি না হলে খাওয়া হয় না। ডাইনীর পেটের ডাইন ছেলে আর কি," এ সমস্ত শুনিয়া শুনিয়া নিবারণ বাবুর আর তেমন কষ্ট বোধ হইত না। তিনি ভাবিতেন যে সৌদামিনী যাহা বলিতেছে তাহা বুঝি সত্য—পঞ্চু ভারি দুষ্ট।

যখন সৌদামিনী প্রথম গৃহে পদার্পণ করেন, তখন পঞ্চুর মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত শিশু-হৃদয় তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মাতৃ-স্নেহ সুখ উপভোগ করিতে চাহিল কিন্তু না-জানি কি অপরাধে স্নেহের পরিবর্ত্তে সে ঘৃণা লাভ করিল। তাহার স্তম্ভিত শিশু-হৃদয় কিছুতেই ইহার কারণ ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না; সৌদামিনীর বক্র ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া তাহার শিশু সুলভ কোমল হৃদয় সঙ্কুচিত—কম্পিত হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিত। সৌদামিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলেই সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। সে যেন কতই অপরাধ করিয়াছে—সে যেন সৌদামিনীর সংসারে কেহই নহে—সৌদামিনীর অনুগ্রহে প্রতিপালিত পালক মাত্র। কথায় বলে "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' পঞ্চুর সকল কার্য্যেই সৌদামিনী তাহার দোষ দেখিতে পাইতেন। তিনি তাহার একটু দোষ দেখিলেই সালঙ্কারে স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতে ত্রুটী করিতেন না। নিবারণ বাবুও সমস্ত শুনিয়া সকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পঞ্চুকে প্রহার করিতেন; হায়! মাতৃহীন বালক ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিত না যে, কি মহা দোষে তাহার প্রতি এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। শুধু সে তাহার কম্পিত ও বেদনাপ্লুত হৃদয়ে তাহার পিতার বিরক্তি সূচক তিরস্কার বাক্য ও চিৎকারই শুনিতে পাইত। 'স্নেহময় পিতার এইরূপ ব্যবহার তাহার বালক সুলভ সরল হৃদয় বুঝিতে পারিত না যে, পিতা তাহার প্রতি স্নেহহীন হইয়াছেন! পিতা প্রহার করিলেও তিনি তাহার চক্ষে কখনও জল দেখিতে পান নাই। অভিমানী বালক নীরবে পিতার সেই কঠোর তিরস্কার ও প্রহার সহ্য করিত। নিবারণ বাবু কাছারি হইতে আসিলেই পঞ্চু 'বাবা'

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইত, কিন্তু আজকাল পিতার নিকট হইতে আপনাকে গোপনে রাখিতে পারিলেই সে যেন বাঁচিয়া যাইত। সে ভাবিত—সে-যা কিছু করে সকলই বুঝি দোষের। সেই জন্য সে অত্যন্ত সাবধানে সঙ্কুচিত ভাবে থাকিত। ভয়ে সঙ্কোচে সে আর পিতার নিকট অগ্রসর হইতে চাহিত না; হৃদয়হীনা বিমাতার কৌশলে প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া যখন অভিমান ও বেদনায় তাহার ক্ষুদ্র বক্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠিত। তখন তাহার পরলোক বাসিনী স্নেহময়ী মাতার স্নেহময় বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকল অভিমান ও বেদনা প্রশমনের জন্য তাহার শিশু হৃদয়-বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, বালক একাকী নির্জ্জনে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিত! হায়! কেহ তাহার আব্দার অভিযোগ বুঝিত না। এমন কেহই নাই যে তাহার অভিমান ও বেদনা দূরীভূত করিয়া সান্ত্বনা দেয়। বালক একাকী ছল ছল নেত্রে বাতায়নপথে নীলগাম্ভীর্য্যপূর্ণ আকাশের পানে চাহিয়া থাকিত। ধীরে ধীরে মৃদু সমীরণ আসিয়া তাহাকে যেন সান্ত্বনা দিবার জন্যই তাহার কুঞ্চিত কেশরাশি দোলাইয়া—তাহার আপাদ মস্তক স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-কোমল হস্ত স্পর্শের ন্যায় তাহার শরীর স্পর্শ করিত। বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছে, বহু পক্ষীর মধুর কুজনে চারিদিক মুখরিত হইতেছে। কত প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া ফুলে বসিতেছে এ সকলের কিছুই আর তখন তাহার বেদনা-হত হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না। তাহার স্নেহ বঞ্চিত হৃদয় মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কখন কখন অরুণকুমার পঞ্চুদা পঞ্চুদা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া শিশু সুলভ কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিত "পঞ্চুদা, তুমি কাঁদচ কেন? তোমার কি হ'য়েছে বল না! না বল্লে আমিও কাঁদব। পঞ্চুদা—পঞ্চুদা বল-না তোমার কি হ'য়েছে!"

হায়! শিশুর সরল হৃদয় যেন তাহার দাদার দুঃখ ক্রন্দন দূর করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত। পঞ্চু চুপ করিয়া থাকিলে সে ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিয়া লুটাইত। পঞ্চু নিজের বেদনা ভুলিয়া অরুণকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে যে কোন প্রকারে বুঝাইত, যে তাহার চোখের জলটা কিছু নয়। তবে সে শান্ত হইত।

একবার পঞ্চুকে তাহার মামার বাড়ীর লোক লইবার জন্য আসিল; পঞ্চু মামার বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু খোকার কথা ভাবিয়া মন একটুকুও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিতেছিল না! সে ভাবিতেছিল যে এখনি

সে কোথা হইতে আসিয়া বুঝি 'পঞ্চুদা' পঞ্চুদা' করিয়া জড়াইয়া ধরে। ফলতঃ তাহাই হইল অরুণকুমার ধুলিমাখা দেহ লইয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া পঞ্চুর বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র অশ্রু বৃষ্টিতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল ; "পঞ্চুদা কাপড় প'রে কোথায় যাবে ?" "আমার মামার বাড়ী", "কেন ?" "লইতে আসিয়াছে" "আমিও যাবো।" পঞ্চু চুপ করিয়া রহিল। অরুণকুমার তাহার মুখ ধরিয়া বলিল "বল-না পঞ্চুদা আমাকে নিয়ে যাবে ?" "ছোট মা বক্‌বেন, বাবা যেতে দিবেন না" "না আমি কিছু শুন্‌ব না আ-মি যাব।" "না ভাই আর একদিন নিয়ে যাব" "না তুমি মিচিমিছি বল্‌ছ, না আমি আজই যাব" পঞ্চু মহা চিন্তায় পড়িল। তাহাকে লইয়া যাইতে তাহার আপত্তি না থাকিলেও বিমাতার কথা মনে পড়াতে তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সৌদামিনী দূর হইতে এ সকল দেখিতেছিলেন, তাঁহারই গর্ভজাত পুত্রের পঞ্চুর প্রতি এরূপ আকর্ষণ দেখিয়া তাহার ভ্রু ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া জোর করিয়া অরুণকে পঞ্চুর কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন। "কোথা মরতে যাবি বল দিকিন্—মরবার কি আর যায়গা নেই ?" বলিয়া তীব্র কটাক্ষে পঞ্চুকে কম্পিত করিয়া ঠাশ্‌ ঠাশ্‌ করিয়া খোকার গালে চড় বসাইয়া দিলেন ; পঞ্চু আর দাঁড়াইতে পারিল না। মামার বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। অরুণ ক্রন্দনের স্বরে বলিতেছিল, "দাদা ও দাদা আমায় নিয়ে যাও। ও দাদা তুমি দাঁড়াও আমি যাই ও দাদা আ—" অরুণের ক্রন্দন শুনিয়া পঞ্চুরও পদদ্বয় চলিতে চাহিল না। সে একবার ফিরিয়া চাহিল। দেখিল অরুণ কাঁদিতেছে। সৌদামিনী চক্ষে সৌদামিনীরই মত জ্বালা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। খোকার করুণ ক্রন্দন তখনও যেন তাহার কাণে বাজিতেছিল। ও দাদা আমায় নিয়ে যাও' ও দাদা দাঁড়াও আমি যাই। তাহার বুকের ভিতর যেন একটা বেদনা সূচীর মত বিদ্ধ করিতে লাগিল। হায়! সে কি করিবে। তাহার সারা অন্তরটা হা-হাকার করিতে লাগিল।

৩

সাতদিন পরে পঞ্চু মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, পঞ্চু আসিতেই অরুণ, দাদা, দাদা বলিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সহস্র অনুযোগ করিতে লাগিল,—"দাদা আমায় নিয়ে গেলে না কেন? তুমি এতদিন ছিলে কেন? আমার জন্য কি নিয়ে এসেছ ? ইত্যাদি ইত্যাদি" পঞ্চু যথাসম্ভব উত্তর দিতে লাগিল। নিবারণ বাবু উভয় পুত্রের জন্য খাবারের পয়সা সৌদামিনীকে দিতেন ; সৌদামিনী

খাবার আনাইয়া অরুণকেই দিতেন, পঞ্চুকে দিতে তাহার হাত আর উঠিত না; পঞ্চু তাহাতে কিছুই বলিত না। সে নীরবে সব অনাদর অপমান, সব দুঃখ কষ্ট, সব পীড়ন সহ্য করিয়া যাইত। তাহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন ইহার জন্যই তাহার জন্ম।

সংসারে প্রকৃতরূপে ভালবাসিলে বা স্নেহ করিলে বুঝি তাহার প্রতিদান পাওয়া যায়। জ্ঞানহীন শিশু তাহার জল খাবারের অর্দ্ধেক দাদাকে না দিয়া আদৌ খাইতে চাহিত না, সে জানিত যে মায়ের সম্মুখে দিতে পারিবে না, তাই লুকাইয়া আনিয়া দিত; পঞ্চু এই শিশুর আচরণে মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিত, 'তুই খা ভাই আমার খাওয়া হয়েছে'। অরুণ কান্নার সুরে বলিত "না দাদা, মিছি মিছি বলছ, তুমি খাওনি, তুমি খাও, না-হলে সব ফলে দেব'খন" "তাহলে ছোটমা বক্‌বে যেরে? তুই খা," "না তবে এই সব ফেলে দিলুম," পঞ্চু উপায়ন্তর না দেখিয়া কিঞ্চিৎ খাইত। পঞ্চু মামার বাড়ী যাইবার দিন হইতে অরুণ তাহার প্রত্যেক দিনের খাবারের অর্দ্ধেক রাখিয়া দিয়াছিল। আজও অত্যন্ত পুলকিত হইয়া চঞ্চল-নৃত্যভঙ্গী করিতে করিতে সেই খাবার আনিতে ছুটিয়া গেল। খাবার লইয়া আসিয়া বলিল, 'দাদা তোমার খাবারের ভাগ নাও, আমি রেখে দিয়েছিলুম,' সৌদামিনীর ভয়ে—বিশেষতঃ তাহাকে যখন দেওয়া হয় নাই, সেই জন্যই পঞ্চু সেরূপ চুরি করিয়া খাওয়া কিছুতেই পছন্দ করিত না, কিন্তু তাহার স্নেহের ছোট ভাইটির স্নেহসিক্ত ছল ছল নেত্রের করুণ-অনুরোধ সে-যে এড়াইতে পারে না। তার-যে সকল অভিমান অপমান মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যায়। সব দিনের খাবার একত্র করিয়া সে মহা আনন্দিত হইয়া সবে দাদার নিকট আনিয়াছে, এমন সময় কাহার কর্কশ কণ্ঠে পঞ্চু শিহরিয়া উঠিল। সৌদামিনী বিদ্যুৎবেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া ঘাড় হেলাইয়া বলিল "পঞ্চা ছেলেকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে বুঝি সব খাবার খাওয়া হয়? ডাইনীর 'পুত' ডাইন্ ও রাক্কুসে পেট কিছুই কুলাবে না বলে কি ছেলের হাত থেকে খাবার কেড়ে গিল্‌বি? আচ্ছা আসুন তিনি", বলিয়া অরুণকে উত্তম মধ্যম দিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পঞ্চু একাকী অশ্রুসিক্ত চক্ষে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। প্রাণের গভীর বেদনায় সে কাতর হইলেও বাতায়ন প্রবাহিত অপরাহ্নের শীতল বায়ু স্পর্শে তাহার নিদ্রা আসিল। সে সেই খানেই লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সৌদামিনী অরুণকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় দেখিলেন তাহার জানু

কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখানে ছিঁড়্‌ল কি করে র‍্যা?' অরুণ কাঁদিতে লাগিল—তাহার মনেই পড়িল না যে বাগানে ছুটছুটী করিতে করিতে আছাড় খাইয়া সে পা ছিঁড়িয়াছে। সৌদামিনী ভাবিলেন এ নিশ্চয়ই পঞ্চার কাজ, "আচ্ছা আসুন তিনি কাছারী থেকে, রাক্কুসে পেট ভেঙ্গে দেব, ছেলেকে এমন করে মারা শিখিয়ে দেবখ'ন ;" এই বলিয়া ভুজঙ্গিনীর মত ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে সৌদামিনী ঘরে গিয়া শুইয়া থাকিলেন। পঞ্চুকে প্রহারে জর্জ্জরিত দেখিবার ইচ্ছা হইলে তিনি প্রায়ই এইরূপ করিতেন ; আজ বিশেষ ঘটা করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকিলেন।

নিবারণ বাবু কাছারি হইতে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার জন্য জল খাবার প্রভৃতি কিছুই আয়োজন নাই। কে কোথায় গিয়াছে তাহারও ঠিকানা নাই। তিনি সৌদামিনীর ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন দ্বার বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করিলেন, কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। পরিশেষে কাকুতি মিনতি করাতে গৃহাধিষ্ঠাত্রীর বুঝি কৃপা হইল, তিনি সজোরে কপাট খুলিয়া দিয়া আবার চুপ করিয়া শুইলেন। নিবারণ বাবু পালঙ্কের নিকট গিয়া অনেক সাধ্য সাধনার পর ক্রন্দনের অনুনাসিক সুরে এই শুনিতে পাইলেন যে, "ও দিন দিন ছেলের হাত থেকে খাবার কেড়ে খায়, আজ আমি জান্‌তে পেরে ওকে বল্‌তে ও আমাকে যা মুখে এল তাই বল্লে। আবার ছেলেকে মেরে তার পা ছিঁড়ে দিয়েছে।" নিবারণ বাবু তখন সদ্য কাছারি ফেরত—বিশেষতঃ সেদিন মক্কেলের অভাবে তাঁহার পকেটে একটির অধিক রৌপ্য চাক্তি উঠে নাই, সেইজন্য তাঁহার মেজাজটাও বেশ কড়া গোছের ছিল, আবার এদিকে প্রিয়তমা পত্নীকে অত সব সাধ্য সাধনা করিতে হইল, সেদিকে পঞ্চুর অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সুতরাং সকল দোষ গিয়া পঞ্চুর উপর পড়িল। শৈশবে যে পিতা, পুত্রের সামান্য কষ্ট দেখিলে সংসার অন্ধকার দেখিতেন এবং কাছারি হইতে আসিয়া কত খোঁজ খবর লইয়া আদর করিয়া কোলে করিতেন, আজ সেই পিতা পঞ্চুর কোন খোঁজ খবর ত লইতেনই না—বিশেষতঃ আজ আবার তাহার রক্ত দর্শন করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সংসারের নিয়মই বুঝি এই। তিনি জীবন্ত ক্রোধের ন্যায় পঞ্চুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, পুত্রের কান ধরিয়া তাহাকে খাট হইতে টানিয়া তুলিলেন। পঞ্চু চমকাইয়া উঠিল। "পঞ্চা তুই খোকাকে মেরেছিলি? তোর ছোট মাকে বকেছিলি?" বলিয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সজোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। হায়! তাহার করুণ অশ্রু

নেত্রের নীরব ভাষা নির্দ্দয় ক্রোধান্ধ পিতার করুণা সঞ্চার করিতে পারিল না। নিবারণ বাবু নির্দ্দয় ভাবে তাহাকে প্রহার করিলেন। পঞ্চু কিছুই বলিল না, কেবল আজ শ্রাবণের ধারার মত ঝর ঝর করিয়া তাহার গভীর অভিমান ও বেদনা গলিত অশ্রু, পিতার পদ সিক্ত করিতে লাগিল। পঞ্চুর শরীর প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইল। নিবারণ বাবু অকথ্য ভাষায় পুত্রকে কতকগুলি গালি দিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চু ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। হায়! আজ যদি তাহার স্নেহময়ী মাতা থাকিতেন তাহা হইলে কি তাহাকে এইরূপ প্রহার সহ্য করিতে হইত? না আজ তাহাকে আপনারই বাড়ীতে নিতান্ত দীনহীনের মত সদা সঙ্কুচিতভাবে কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়া কাল যাপন করিতে হইত? প্রহারের বেদনায় ও গভীর মনোবেদনায় জর্জ্জরিত পঞ্চুর জ্বর আসিল, বেচারা একাকী অন্ধকারে আপনাকে আপনি নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

৪

সন্ধ্যার সময়ে নিবারণ বাবু পঞ্চুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন পঞ্চু ঘুমাইতেছে; বালিশের পাশে মাথাটা এলাইয়া পড়িয়াছে—গণ্ডে শুষ্ক অশ্রুর চিহ্ন। বোধ হইল যেন সে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিবারণ বাবুর মনটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি সে এতক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিতেছিল? তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন তাহার গা গরম। উজ্জ্বল দীপালোকে তাহার মুখ খানি, অশ্রুসিক্ত করুণ-স্তিমিত নয়ন দেখিয়া আজ তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা কাঁপাইয়া একটা ক্ষোভ ও অনুতাপের ঝটীকা বহিয়া গেল। তাঁহার নয়নের সম্মুখ হইতে যেন একটা মস্ত পুরু আবরণ সরিয়া গেল। বর্ত্তমানের ছবি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে একেবারে অদৃশ্য হইল। কেবল অদূর অতীতের একটা সুখ-স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া হঠাৎ তাঁহার মনের ভিতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। পত্নীর মৃত্যু সময়ে সেই বিষাদ করুণ দৃষ্টি। হায়! সে তাহার স্নেহের দুলাল পঞ্চুকে তাঁহার হাতে অটল নির্ভরতার সহিত সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাহার কি যত্নই লইতেছেন! পুনরায় বিবাহ না করিবার সেই প্রতিজ্ঞা, পঞ্চুর প্রতি অগাধ স্নেহ, সকলই ধীরে ধীরে তাঁহার মনের উপর ফুটীয়া উঠিতে লাগিল। হায়! পঞ্চুর একটু দুঃখ যে তিনি দেখিতে পারিতেন না। পঞ্চু কাছে না থাকিলে যে তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেন।

পঞ্চুর মা আজ বাঁচিয়া থাকিলে কি তাহার আজ এ দশা হইত। আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে কি এ-সব সহ্য করিতেন? নিবারণ বাবুর মনটা যেন হঠাৎ কেমন দমিয়া গেল। প্রাণের ভিতরটা হা-হাকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, হায়! তিনি পিতা হইয়া কোন প্রাণে মাতৃহীন বালককে এই প্রকার অল্প কারণে প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেছেন। তাঁহার প্রাণ কেন এমন পাষাণ হইয়া গেল? সৌদামিনীর প্ররোচনায় পঞ্চুর প্রতি স্নেহধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; আজ যেন শতধারে বহিয়া চলিল। পাষাণ গলিয়া যেন জল হইয়া গেল। তাঁহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি সকল ভুলিয়া গিয়া বহুদিন পরে আজ পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্রের জ্বর তপ্ত গণ্ডে চুম্বন করিলেন।

রাত্রে তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তাঁহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল পঞ্চুর মাতার সেই সকরুণ শেষ অনুরোধ "ওগো তুমি থাকলে ওর যেন অযত্ন না হয়" এই শব্দটি যেন গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইয়া আজ তাঁহার কাণের নিকট ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ বাজিতে লাগিল। তিনি সে দিন আর আহার করিলেন না। পরদিন শয্যা হইতে উঠিয়া তিনি পঞ্চুকে বিছানায় দেখিতে পাইলেন না। চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। মাতৃহীন বালক বিমাতার অত্যাচারে—পিতার অবিচারে বেদনা-হত-হৃদয়ে বিশাল পৃথিবীর বক্ষে কোথায় আপনার নিজস্বকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সংগুপ্ত করিয়া ফেলিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

৫

একমাস কাটিয়া গেল। পঞ্চুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অরুণ একেবারে বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছে! সে আর কথা বলিতে পারে না—বিশেষতঃ আজ সকাল হইতে সে আর কথা বলে না! চোখ মিলিয়াও চায় না। অনেকবার ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া যায় নাই। শুধু একবার মাত্র অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "বাবা এখনও পঞ্চুদা এলনা?" ডাক্তার বলিয়া গেলেন, অত্যধিক মানসিক আঘাতে এরূপ হইয়াছে। ইহার প্রতিকার ঔষধে শীঘ্র হইবে না! নিবারণ বাবু উদাস-নয়নে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সৌদামিনী কত ঠাকুর দেবতার উদ্দেশ্যে মাথা কুটীতে লাগিলেন। হায়! এই শিশুর ক্ষুদ্র জীবন দীপটুকু আজ বুঝি নিভিয়া যায়।

হঠাৎ বাহিরে ও কে ডাকিল "বাবা, বাবা খোকা কোথায়? বাবা তুমি

কোথায় ? খোকা খোকা !" বলিয়া কুঞ্চিত কেশরাশি মাথায় লইয়া এক বালক ভিতরে প্রবেশ করিল ! বুঝি কোন দেবতার দয়া হইল। "বাবা, বাবা, খোকার কি হয়েছে ? খোকা তুই এমন হলি কেন ভাই ? তোকে এমন অবস্থায় দেখবার আগে আমি কেন মরিনি ? খোকা খোকা একবার চা—একবার দ্যাখ তোর হৃদয়হীন হতভাগ্য পঞ্চুদা এসেছে।" বলিয়া কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অরুণকে কোলে তুলিয়া লইল। ঝর ঝর করিয়া তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু প্রবাহ ছুটিল। অরুণ একবার চাহিল তারপর "পঞ্চুদা" "পঞ্চুদা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বুঝি তাহার দাদার স্পর্শে তাহার জীবনীশক্তি পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল। নিবারণ বাবু ও সৌদামিনী উভয়েই উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। "ওরে পঞ্চু তুই কোথায় গেছলিরে ? কি দেখতে তুই এলি ? দেখ-রে তোর জন্যে তোর খোকার কি দশা হয়েছে। আর একটু পরে এলে তুই কি দেখতিস-রে।"

পঞ্চু নীরবে তাঁহাদের বক্ষ সিক্ত করিতেছিল। আহা! এ দৃশ্য কি পবিত্র!

শ্রীসতিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

নিষ্ফলতার সার্থকতা

আমি গতবারে মানবজীবনের প্রকৃত উন্নতির জন্য, মানব জীবনের প্রকৃত উপলব্ধির জন্য প্রতিনিয়ত মহৎ ও সাধু উদ্দেশ্যে নিষ্ফল প্রয়াসের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে দুইটি চিত্র উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মানব-জীবনের একটি অতি গূঢ় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। Andrea Del Sarto ধন মান যশ ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা বৃহৎ অট্টালিকা অলৌকিক রূপ-লাবণ্যসম্পন্না স্ত্রী—বাহির হইতে সংসার যাহাকে পরিপূর্ণ সুখ ও সম্পদ বলিয়া গণনা করে, তাহার মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে অতি দীন হীন দরিদ্র বোধ করিতে লাগিলেন এবং ধনমানহীন অক্ষম দুর্ব্বল ও দুরন্ত সংগ্রামে নিষ্পেষিত প্রাণের অনন্ত পিপাসার জন্য হাহাকার করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সকল সুখ ও সম্পদ পাইয়াও তাঁহার প্রাণের হাহাকার গেল না, এত সুখ ও সম্পদের মধ্যে ডুবিয়াও তাঁহার প্রাণ তৃপ্ত হইল না! আর জীর্ণ কুটীরে ঘোর অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে চিরজীবন বাস করিয়া ও সংসারের যশ মান সুখ, সম্পদ হইতে চিরদিন বঞ্চিত হইয়াও জরা ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে সেই দরিদ্র শিক্ষক অপার

অসীম আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করিতে করিতে পৃথিবীর জীবন শেষ করিয়া গেলেন। একজন সুখ ও সম্পদের মধ্যে অতৃপ্তি ও অন্যজন দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে তৃপ্তি পাইলেন; আমাদের মত সাধারণ লোকের চক্ষে ইহা অতি রহস্যময় ব্যাপার, অতি বিপরীত ব্যবহার বলিয়াই মনে হয়। শৈশবকাল হইতে দৃশ্য বস্তুকেই সত্য বলিয়া চিনিতে ও জানিতে শিখিয়া ও চিরজীবন এই দৃশ্য বস্তুর আহরণ ও সঞ্চয়ের জন্য দুরন্ত সংগ্রাম করিয়া এই স্থূল বস্তুর অতীত আর যে কোনও সত্য বস্তু আছে বা থাকিতে পারে তাহা আমরা এখনও স্থির নিশ্চয় রূপে বুঝিতে বা ধরিতে পারি নাই! আমরা যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি তাহার শক্তিপুঞ্জের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া, তাহাদিগকে অধিকার করিয়া, তাহাদিগের উপর রাজত্ব করিয়া, অনুর্ব্বরা ভূমিকে উর্ব্বরা করা, পতিত ভূমিকে সুন্দর গ্রাম ও নগরে পরিণত করা, শিক্ষা ও বাণিজ্য বিস্তার করা, নরনারীর অবস্থা উন্নত করা,—দূর সুদূর দেশসকলকে নানাযোগে যুক্ত করিয়া এক মহামানব সমাজের সৃষ্টি করা, ইহা ত প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য ও অধিকার। প্রকৃত মনুষ্যত্বের ইহাই প্রথম সোপান। আমাদের পিতা মহান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে তাঁহার সহযোগী সহকর্ম্মী হইয়া তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যে তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য ডাকিতেছেন। এ মহাঅধিকার হইতে কে বঞ্চিত হইবে? কর্ম্ম কর কর্ম্ম কর, যে যত পার তাঁহার রাজ্যকে সুন্দর কর উন্নত কর। তাঁহার কাজে তোমাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় কর। নিশ্চয় জানিও যতই তুমি তোমার শক্তি ও সামর্থ্যের ব্যবহার করিবে—ব্যয় করিবে ততই তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া দিবেন। শক্তির সমুচিত ব্যবহার করিয়া কেহ কখনও তাহা নিঃশেষ করিতে পারে নাই, শক্তির ব্যবহার না করিয়াই বা অপব্যবহার করিয়াই কেবল তাহা মানব হারাইয়া ফেলিয়াছে। মানুষ কেবলমাত্র নিজের জড়তা অলসতার জন্য এ মহাঅধিকার হইতে, এ মহা আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বকে সুন্দর করিতে হইলে প্রথমে নিজের গৃহকে সুন্দর করিতে হয়, জগতে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমে নিজের জীবনকে শৃঙ্খলিত ও নিয়মিত করিতে হয়, অন্যকে সাহায্য করিতে হইলে প্রথমে নিজে বল সঞ্চয় করিতে হয়। সুন্দর গৃহ, নিয়মিত ও পরিমিত আহার ব্যবহার, নির্ম্মল পরিচ্ছদ মন ও আত্মাকে যে কত সাহায্য করে তাহা বলা যায় না। গৃহকে সুন্দর করিতে যাইয়া, নিয়মিত করিতে যাইয়া মানব প্রতিদিন শক্তিপুঞ্জের সহিত সংগ্রাম করিয়া

ও তাহাদিগকে জয় করিয়া যে অর্থ, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতেছে তাহা কখনই অন্যায় বা পাপ নহে।

সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই,
পিতার ধনে মোদের পূর্ণ অধিকার।

কিন্তু নিশ্চয়ই, আমরা কি রাজপুত্রের মত সদর্পে সগর্ব্বে সসম্মানে ও সন্তুষ্টচিত্তে নিজের ন্যায্য অধিকার দখল করিতে চাই, না দীন ভিক্ষুকের ন্যায় সভয়ে ও শশঙ্কচিত্তে তাহার জন্য ভিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হই। রাজপুত্রের ন্যায় পিতার সহযোগী ও সহকর্ম্মী হইয়া তাঁহারই প্রদত্ত রাজ্য অধিকার করায় কখনও পাপ নাই, কিন্তু নিজের দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া ক্রীতদাসের মত দাতাকে ভুলিয়া কেবল তাঁহার দানের আশ্রয় লওয়ায় নিশ্চয় পাপ আছে। এবং পরমপিতার দানগ্রহণ সম্বন্ধে আমাদের একটি ভ্রান্ত ও মহা অনিষ্টকর ধারণাই আমাদিগকে মহা সত্তার উপর অবিচলিত নির্ভর হইতে নিয়ত বিরত করিতেছে। সাধারণতঃ মনে হয়, প্রিয় পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ ও সুখের জন্য দিনরাত যে লোক, দুরন্ত পরিশ্রম করিতেছে ও বহুল অর্থ উপার্জ্জনের দ্বারা সুখে সচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছে, তাহার প্রাণে অনন্তের পিপাসা কেমন করিয়া থাকিতে পারে? সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকায় যে বাস করে, নির্ম্মল ও সুশোভন পরিচ্ছদ যে পরিধান করে, আনন্দমনে যে হাস্য পরিহাস করে, এক কথায় দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যে দিবারাত্র যে বিহার করিতেছে, তাহার প্রাণে অপ্রত্যক্ষ মহাসত্তার উপর নির্ভর আসিবে কিরূপে? আমরা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, বাস্তব ও অবাস্তব রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে বিভাগ করিয়া ফেলিয়াছি। যদি সুন্দররূপে সুচারু রূপে গৃহকর্ম্ম করিতে চাও তাহা হইলে আর ধর্ম্ম অর্জ্জন করা হইবে না। এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন যদি করিতে চাও তাহা হইলে তোমার প্রিয়পরিজনের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিয়া, তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তাহাদের কার্য্যকারিতা অর্জ্জনের সাহায্য করিয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতে ও প্রাণের আনন্দ পাইতে পারিবে না। এইরূপে ধর্ম্মকে কর্ত্তব্যের ও স্বাভাবিক আনন্দের বিরোধী করিয়া তুলিয়া আমরা সংসার হইতে ধর্ম্মকে দূরে সরাইয়া দিয়াছি বা তাহাকে ক্ষণিকের স্মরণীয় বস্তু করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। যিনি প্রাণের প্রাণ প্রাণের প্রিয়তম তাঁহাকে ভ্রান্ত ধারণাবশে সভয়ে ও সন্দেহে দূরে রাখিতেছি। কিন্তু অনন্তের সন্তান মানব তাহার অনন্ত পিতাকে কি আদৌ চাহিতেছে না? নিশ্চয়ই চাহিতেছে। কিন্তু সে যে তাহার প্রিয়

সংসারকে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। যদি ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে তবে বুক ভরিয়া এত স্নেহ, এত প্রেম, এত প্রীতি, এত সৌহার্দ্দ তিনি কেন দিলেন! মানব কাঁদিয়া ইহার উত্তর চাহিতেছে। তবে এই ভ্রান্ত ধারণাকে ভাঙ্গিয়া দাও—শত শত বৎসরের সঞ্চিত বংশপরম্পরার যে ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহাকে সবলে সমূলে উৎপাটিত কর, এবং আজ সানন্দমনে মুক্ত হৃদয়ে কবির সহিত গান কর,—

"জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে
সে গান কবে গম্ভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি;
রয়েছ তুমি একথা কবে জীবন-মাঝে সহজ হবে
আপনি করে তোমারি নাম ধ্বনিতে সব কাজে॥

এমনি করিয়া প্রাণ ভরিয়া জগৎকে ভালবাস, এমনি করিয়া দেহ মন প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁহার চিরসুন্দর, চিরমধুর, চির আনন্দময় সত্তা অনুভব কর। কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া, সত্যপথে চলিতে যাইয়া যে দুঃখ কষ্ট আসে, তাহাকে ভয় করিও না, তাহা পরমপিতার প্রেমের দান, স্থিরভাবে তাহা গ্রহণ কর। কিন্তু তাই বলিয়া পিতার নিকট যাইবার পথ, তাঁহার আদেশ পালন করিবার এবং তাঁহাকে পাইবার উপায়, দুঃখময় কষ্টময় এ মহা মিথ্যা ধারণা কখনও মনে আনিওনা। মুক্ত সুস্থ সতেজ বলিষ্ঠ আনন্দময় প্রাণ লইয়াও প্রাণের অনন্ত পিপাসা মিটাইবার জন্য কোন দুরন্ত চেষ্টা, কোন অবিশ্রাম অধ্যবসায়, কোন জীবনব্যাপী নিষ্ফল প্রয়াসকে ভয় হয় বা তাহা হইতে বিরত থাকিতে ইচ্ছা করে। এবং দিনের পর দিন জীবনের শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া মানব যে অনন্তের সহিত যোগ হারাইতেছে না, এমন কথা বলি না; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে ভুল বিশ্বাস মানবকে সত্য পথ হইতে কতদূর বিচলিত করে—মানবজীবন কি পরিমাণে বিকৃত করিয়া তোলে। এ সম্বন্ধে আমি কবি Robert Browning হইতে একটি চিত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কবিতাটির নাম Bishop Bhoughams Apology.

ইতালি সহরে সুন্দর ও সুসজ্জিত অট্টালিকায় নানা সুখ ও সম্ভোগের মধ্যে

Blougham নামে এক ধর্ম্মযাজক বাস করিতেন। সেই সহরেই অল্প আয় লইয়া, প্রতিদিনের দুরন্ত জীবনসংগ্রামের মধ্যে গিগাডাস নামে এক লেখক তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিয়া ভ্রান্ত ধারণা ও ঈর্ষা বশতঃ এই ধর্ম্মপ্রচারকের নামে নানা বিরুদ্ধবাদ প্রচার করিতেন। Blougham সুশিক্ষিত স্থিরবুদ্ধি, ধর্ম্মভীরু, মিষ্টস্বভাব ও রহস্যপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি এই বিরুদ্ধবাদে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত না হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদী Gigadibsকে একদিন আহারন্তে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। Gigadibs ও তাঁহার গৃহের ও আহারাদির ঐশ্বর্য্য দেখিবার কৌতূহলপরবশ হইয়া এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নানা সুখসেব্য আহারাদির পর আরামপ্রদ আসনে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। Bishop Blougham এর বিরুদ্ধে Gigadibs এর প্রথম অভিযোগ এই যে, Bishop Blougham জীবনের যে সব উচ্চ আদর্শের কথা প্রচার করিতেছিলেন ও নিজে সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা করিতে হইলে তাঁহার জীবনের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া আদর্শের অনুযায়ী করিয়া লওয়া উচিত। এইরূপ ধন ঐশ্বর্য্য সুখ, সম্পদের মধ্যে বাস করিয়া মানুষ তাহার প্রাণের উচ্চ আদর্শকে কখনও রক্ষা করিতে বা সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। তিনি যখন তাহা করেন না তখন তাঁহার প্রচারিত উপদেশ বা তাঁহার জীবনের সাধনা কখনও সত্য হইতে পারে না। তাহার উত্তরে Bishop Blougham বলিলেন—

"The Common problem, yours, mine, every ones
Is not to fancy what were fair in life
Provided it could be,—but, finding first
What may be, then find how to make it fair
Up to our means—a very different thing
No abstract intellectual plan of life
Quite irrespective of life's plainest lawr
But one, a man, who is man & nothing more
May lead within a world which is Rome or London."

"তোমার, আমার, প্রতিজনের পক্ষে সাধারণ সমস্যা এই যে, আমাদের জীবনের অবস্থা কি রকম হইলে আমাদের জীবন সুন্দর ও সফল হইতে পারিত, তাহা কেবলমাত্র কল্পনা করা নহে কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জীবন যে অবস্থার মধ্যে

রাখিয়াছেন, সেই অবস্থার সুযোগ ও সুবিধা জানিয়া তাহারই মধ্যে অবস্থিতি করিয়া আমাদের শক্তি ও সাধ্যমত আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সফল করিয়া তুলিবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ইহা মানবের দৈনিক জীবনের কল্পিত চিত্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিন্তু ইহা জীবনের এমনি একটি নিয়ম, যাহা মানব দুর্ব্বল ভারাক্রান্ত নিষ্পেষিত মানব, Rome or London বা যে-কোন সহরের মধ্যে বাস করিয়াও পালন করিতে পারে।"

কি সত্য কথা! আমরা আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই কি এই কল্পনা মিথ্যা অভিযোগ করিয়া কাটাইয়া দিতেছি না? প্রতি প্রভাতে আমরা নূতন জগতে, নূতন আলোকে, নূতন প্রাণ লইয়া নব নব শক্তি সহায় ও সুযোগের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছি, আর প্রতি সন্ধ্যায় ব্যর্থ দিনের মৃত কঙ্কাল বহন করিয়া নিস্তেজ, নির্জীব, নীরস প্রাণ লইয়া অন্ধকারে বসিয়া মিথ্যা অভিযোগ ও দোষারোপ করিয়া হীন, মলিন ও অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছি। বিশ্বাসী কর্ম্মীগণ অবস্থার দিকে না তাকাইয়া কেবল লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া প্রাণপণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন—ফলে অবস্থা লক্ষ্যের অনুকূল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অবস্থার দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যকে অবস্থার অনুযায়ী করিতে যাইতেছি, ফলে অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হইতেছে না কিন্তু লক্ষ্য হারাইয়া যাইতেছে। ঈশ্বর অগণ্য নরনারীকে ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন শরীর মন ও আত্মা দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে আনিয়াছেন। ইহা তাঁহারই সৃষ্টি—তাঁহারই অভিপ্রেত। জগতে এ বিচিত্রতার এ বিভিন্নতার বিশেষ উদ্দেশ্য ও সার্থকতা আছে। ছোট, বড়, দুর্ব্বল, বলবান, মূর্খ ও জ্ঞানী তাঁহার বিশ্বরাজ্যে সকলেরই আবশ্যকতা আছে। আজ জগৎ জুড়িয়া যে মহা ঐক্যতানের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সকলেরই বিভিন্নভাবে যোগ দিবার অংশ আছে। একে অপরের মত হইতে পারিলাম না বলিয়া মিথ্যা অভিমানে নীরব থাকিলে চলিবে না। তুমি যেমন তেমনি তোমার সংযোগ তিনি চান। প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও; তোমার যাহা আছে তাহা তাঁহাকে দিবার জন্য উপযুক্ত কর—প্রস্তুত কর। তোমার শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত পরিমাণ ত তিনি জানেন। অবস্থার ভ্রান্ত ধারণা লইয়া তাঁহার সহযোগী হইবার মহৎ অধিকার ও অপার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইওনা।

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা
আমার হিয়ায় চল্‌ছে রসের খেলা
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাইত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরচ্ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।
তাইত প্রভু যেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

ইহা কবিতা নহে, কল্পনা নহে; ইহা সত্য, অতি সত্য কথা। আজ জগতের দূর সুদূর স্থান হইতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাশীল ও কবি একই মহাসত্যে উপনীত হইয়া এই কথাই প্রচার করিতেছেন। ঈশ্বর করুন, আমরা প্রত্যেকে আমাদের দৈনিক জীবনে ইহা সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দেবকুমার

১০

দেবকুমার চলিয়া গেলে নিরুপমা তাহার পিতাকে কহিলেন, "বাবা, আজ তুমি আমার কাছে তর্কে হারবে।"

চারুবাবু সহাস্যমুখে উত্তর করিলেন 'কেন মা? কিসে তুমি হারাবে!"

নিরুপমা। তুমি বল যে লোকে সুখের জন্য সব কাজ করে। কিন্তু দেবকুমার বাবু যে নিজেকে বিপদে ফেলে আমাদের বাঁচালেন এ কাজ তিনি কোন সুখের জন্য করলেন?

চারুবাবু। আমি কি বলি যে সব কাজই মানুষ সুখের আশা করে ক'রে ? তা-ত নয়। প্রথমে মানুষ যখন কাজ করেছিল, তখন সুখের আশা নিয়েই করেছিল। ক্রমে সে সুখের আশা মন হ'তে চলে গেছে। কিন্তু সেই কাজগুলি করবার ইচ্ছা হেরিডিটির (বংশানুক্রমে) ফলে রয়ে গেছে; তাই পূর্ব্বে যেগুলি সুখের ইচ্ছায় করত, এখন তা নিঃস্বার্থভাবে করতে পারে।

নিরুপমা। পরার্থপরতার মৌলিক ভাবটি মানুষের মনে না থাকলে কখন যে মানুষ নিজের জীবনকে বিপদে ফেলে কাজ করতে পারত, এ আমার বিশ্বাস হয়না। এতবড় কাজ কি কখনও সুখের আশায় কোনদিন মানুষে করতে পারে !

চারুবাবু। সে কথা যা'ক, আর কিসে আমাকে হারাবে ?

নিরুপমা। তুমি যে বল হেরিডিটির (বংশানুগত সংস্কার) ফল কেহ এড়া'তে পারেনা; এইজন্য তুমি বল যে জাতিভেদ থাকবেই। কিন্তু দেবকুমার বাবু ত চণ্ডালের ছেলে, তাঁর চণ্ডালের মত সংস্কার ত একটুও দেখলাম না। অনেক ব্রাহ্মণের চেয়ে তাঁকে ভাল দেখলাম। এখানে তোমার Hereditory principal (বংশগত সংস্কার) কোথায় ?

চারুবাবু। জাতিভেদ কি অত সহজে অস্বীকার করা যায় ? দেবকুমারের সম্বন্ধে ত সকল কথা আমরা জানিনে। চণ্ডালের সংস্কার তার মধ্যে যে নাই, তা আমরা এখনও জানিনে। লোকে জাতি ভেদের সম্বন্ধে আর যে সব যুক্তি দিয়ে থাকে সে সকল কিন্তু আমার নিকট অতি অসার বলে মনে হয়। কেবল বংশগত সংস্কার আছে বলে, আমি জাতিভেদ মানি। ব্রাহ্মণের ছেলে যতই মূর্খ হউক, তার ব্রাহ্মণবংশের সদগুণ না থেকে যায় না। সেইরূপ চণ্ডালের ছেলে যতই ভাল হউক না কেন, তার বংশের দোষ কিছু না থেকে যায় না।

নিরুপমা। জন্মগত সংস্কার কি আগে হতেই ছিল, না জাতিভেদ সৃষ্টি হ'বার পরে হয়েছে ?

চারুবাবু। যখন জাতিভেদের সৃষ্টি হয়নি,—যেমন বৈদিক যুগে, তখন জাতিগত সংস্কার বলে কিছু ছিল না। তখন যত সব কুসংস্কার ছিল সব পরিবারগত। কিন্তু ক্রমে যখন জাতিভেদের সৃষ্ট হ'ল, তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির কাজ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। কাজে অনেক সময়ে মানুষের প্রকৃতি গঠন করে। তাই যাঁরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চা নিয়েছিলেন, তাঁহাদের ধার্ম্মিক, নিঃস্বার্থ ও সচ্চরিত্র হওয়াই স্বাভাবিক; সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের সাহসী, রাগী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও সরল

হয়েছে। আবার শূদ্রের পরাধীন, জ্ঞানহীন, ক্ষুদ্রমনা অনেকটা নির্ব্বোধ হয়েছিল, অনেকটা আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের সহিত তাদের তুলনা হয়। এসকল সংস্কার প্রতি জাতির মধ্যেই রয়েছে।

নিরুপমা। তুমি যে বললে জাতিভেদের অন্য যুক্তিগুলি নিতান্ত অসার, সেগুলো কি ?

চারুবাবু। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলেন, ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণ, হাত হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য আর পা হতে শূদ্র হয়েচে। ব্রহ্মাই যখন কল্পনা, তখন তার হাত, পা, মুখ, হতে লোক কি কর্যে হবে ? তবে যাঁরা এতটা বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও বলেন যে মূলেই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি করে মানব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান এখন যা বলচে, তাতে একথা কিছুতেই টেঁকে না, জানত, বানরই ক্রমে উন্নত হয়ে বহুযুগ পরে মানবদেহে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বর এক এক জাতিকে এক এক কাজ দিয়ে সৃষ্টি করেন নি। কেউ কেউ বলেন, কার্য্যবিভাগের জন্য জাতিভেদের সৃষ্টি—আর সেইজন্যই জাতিভেদ থাকাও উচিত। কিন্তু এ কথাতেও জন্মগত জাতিভেদের কোন কারণ পাওয়া যায় না। কারণ যার যে ব্যবসা ইচ্ছে তা করলে, Divition of labour (কার্য্যবিভাগের) কোন বাধা হয় না। জাতিভেদ কেবল এক Principl of Heridity (বংশগত সংস্কার) দ্বারাই সমর্থন করা যায়। ব্রাহ্মণের ছেলের অনেকটা ব্রাহ্মণের মত চরিত্র হয় ; শূদ্রের ছেলের শূদ্রের মত সংস্কার হয়। যে যে জাতিতে জন্মেছে, তার সেইরূপ প্রবৃত্তি কিছু পরিমাণে না থেকে যায় না। আমি এইজন্য জাতিভেদ মানি। খাওয়া-দাওয়া ছোঁয়া-ছুতে কিছু হয় না।

নিরুপমা। কিন্তু এক জাতির লোক অন্য জাতির গুণও অনেক সময়ে পেয়ে থাকে। বুদ্ধ যে বংশে জন্মেছিলেন সে বংশে যুদ্ধই ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু তিনি সকল ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ। যিশু সূত্রধরের পুত্র ; নানক বৈশ্যের সন্তান, কবীর জোলা। কিন্তু এঁরা বংশগত সংস্কার ছেড়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন।

চারুবাবু। দু একটা দৃষ্টান্তে কি শত শত লোকের দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য করা যায় ? মানবসমাজের Heridityর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নিরুপমা। Heridityর বিরুদ্ধে যদি অনেক দৃষ্টান্ত পাও তা হলে কি বিশ্বাস করবে ?

চারুবাবু। তুমি আমাকে যখন সেরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখাবে, তখন বিবেচনা করব।

১১

দেবকুমার যে কয়েকদিন কলিকাতায় ছিলেন, চারুবাবুর গৃহে প্রতিদিনই যাইতেন। চারুবাবু তাঁহাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিতে এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাকে যেন সংবাদ দিতে ত্রুটি না করেন ইহা বলিয়া দিলেন।

দেবকুমার যথাসময়ে জাহাজে উঠিলেন। এ কয়েক দিনেই তাঁহার জীবনে যেন একটা নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। বহুদিনের বন্ধুদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, এইরূপ তাঁহার মনে হইতে লাগিল। নিরুপমার স্বাভাবিক সরলতা, বিনয়, এবং সৌজন্য তাঁহার মন অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। এমন একটি স্বাভাবিকতা তাঁহার মধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন, যাহা তাঁহার পরিচিত অপর কোন নারীর মধ্যে পূর্ব্বে দেখিতে পান নাই। নিরুপমাকে পত্নীরূপে পাইবার বাসনা যেন আপনা হইতেই মনের মধ্যে একবার আসিল, কিন্তু সে চিন্তা তখনই মন হইতে দূর করিয়া দিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, সে অতি নীচ জাতি; তাঁহার নিজের মিষ্টার বসু-প্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকা মাত্র সম্বল; ওরূপ ধনী, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সুন্দরী কন্যার তিনি নিতান্তই অযোগ্য। কিন্তু নিরুপমার চিন্তায় তাঁহার মনে একটি স্নিগ্ধতা ও শান্তিজনিত মধুর ভাব আনিয়া দিল।

প্রথম সমুদ্র দর্শনে তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ও জাহাজের তলদেশে আঘাত করিতেছে। চারিদিকে দূর দূরান্তরে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। আকাশ যেন অবনত হইয়া সস্নেহে সমুদ্র চুম্বন করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে প্রেমের যোগ দেখাইয়া দিতেছে। উপরে অনন্ত আকাশ ও সম্মুখে প্রান্তহীন সমুদ্র এবং তাহার পরে মন যখন দৃশ্য ছাড়িয়া দৃষ্টির অতীত আকাশে কোটি কোটি বিশ্বের কল্পনা করে, তখন মন ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে, সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্তত্ব ও গৌরব স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক সহজেই নত হয়।

দেবকুমারবাবু যে কয়েক দিন জাহাজে ছিলেন, এইরূপ নির্জ্জনে অনেক সময় বসিয়া কাটাইতেন। জাহাজে তাঁহার একটি বন্ধু মিলিয়াছিল। ইনিও মান্দ্রাজ-যাত্রী জনৈক বাঙ্গালী। সময়ে সময়ে উভয়ে ডেকের উপর বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইতেন। একদিন তাঁহারা জাহাজের ডেকের উপর দুইখানি চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; এমন সময়ে একজন ইংরেজ আসিয়া বলিল, "বাবু তোমরা অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে আছ। এখন তোমরা অন্যত্র যাও আমি এখানে বসব।"

দেবকুমার কহিলেন, "কেন, তুমি অন্য চেয়ারে যাও। ডেকের উপর অনেক বসবার যায়গা আছে।"

ইংরাজ বলিল, "এ চেয়ারে নেটিবদের বসবার অধিকার নেই।"

এইরূপে বচসা হইয়া ক্রমে মারামারি উপস্থিত হইল। ডেকের উপরে পড়িয়া উভয়ে উভয়কে হারাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বন্ধু এই গোলমাল দেখিয়া কাপ্তেনকে সংবাদ দিতে গেলেন। কাপ্তেন আসিলে ইংরেজটি বলিল,—"এই নেটিব আমাকে অপমান করেছে। আমি তার উপযুক্ত শাস্তি দেব।"

কাপ্তেন একজন ফরাসী, এবং পূর্ব্বেই তিনি সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "নেটিব?—আমি এ জাহাজে নেটিব ও ইউরোপীয়ানের কোন বিভিন্নতা রাখি নে। তুমি যদি এত নেটিব-হেটার হও, অন্য জাহাজে গেলেই পারতে?" পরে দেবকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—দেখুন যদি ইনি ফের অন্যায় ব্যবহার করেন, আমাকে জানালে আমি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব।

ইংরেজটি মার খাইয়া ও কাপ্তেনের নিকট তিরস্কৃত হইয়া বিষণ্ণবদনে নিজ স্থানে চলিয়া গেল। দেবকুমার ও ভদ্রলোকটির পুনরায় কথা আরম্ভ হইল।

দেবকুমার। আমার এক এক সময়ে ইচ্ছা হোত যে খৃষ্টান হই। কিন্তু এদের দেখে দেখে, আর ইচ্ছা করে না। একমাত্র হিন্দুসমাজেই যে জাতি-বিদ্বেষ আছে, তা নয়, ইংরেজদের মধ্যেও এই জাতিবিদ্বেষ প্রবল।

বন্ধু। তাইত, কোথায় যিশু বললেন, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস" এরা প্রতিবেশীকে কুকুরের মতও ভালবাসে না।

দেবকুমার। কিন্তু সব ইংরেজ এরূপ নয়। অনেকে গুণের আদর করেন। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে, বিজাতি-বিদ্বেষ এদের মধ্যেও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে না। শূদ্রকে ঘৃণা করে, ব্রাহ্মণ জাতির যে দশা হয়েচে, মনে হয় কালে এদেরও সেই দশা হবে।

বন্ধু। আপনি কি বলেন যে আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতি জাতিভেদের ফল।

দেবকুমার। আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না, কিন্তু আমি অনেকটা তাই মনে করি। আর্য্য ও অনার্য্য মিলে যদি প্রাচীন কালে একজাতি হোত, সে জাতি কত উন্নত ও শক্তিশালী হতে পারত। কিন্তু অনার্য্যদের অস্পৃশ্য ও দাস করে রাখাতে, অনেক ক্ষতি হয়েছে। আর্য্যেরা অনার্য্যদের প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করতেন, ক্রমে তা তাঁদের মধ্যে এসে পড়ল। ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে, বৈশ্য শূদ্রকে, প্রতি উচ্চবর্ণ নীচবর্ণকে সেইভাবে ঘৃণা করতে লাগল।

এর অবশ্যম্ভাবী ফল যা তা-ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। জাতি দুর্ব্বল ও সমাজ প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। আমাদের যে অবস্থা হয়েছে, ইংরেজরাও যদি এই ভাবেই চলে, ভবিষ্যতে তাদেরও এই অবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়।

বন্ধু। সেবার চট্টগ্রামের এক ষ্টীমারকোম্পানি ষ্টীমারে সাহেব প্যাসেঞ্জার ছিল বলে বাঙ্গালীকে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট দিলে না। বন্ধুটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, চলুন এখন নীচে যাওয়া যাক্।

১২

যথাসময়ে দেবকুমার মান্দ্রাজে পৌছিলেন। মিষ্টার আয়ার দেবকুমারকে অভ্যর্থনা করিলেন। এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, তাঁহাকে কি কাজ করিতে হইবে সেই সকল বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

মিঃ আয়ার কহিলেন—"আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, আর আমি আপনার পিতৃস্থানীয়ও বটে, যদি কখনও কিছু রূঢ় কথা বলি, সেগুলি পিতার তিরস্কার বলেই মনে করবেন। তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না। কাজ সম্বন্ধে আপনি ব্যাঙ্কের চার্জ্জে রইলেন। কিন্তু কোন কাজ আমার সহিত পরামর্শ না করে করবেন না। প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক আমারই চার্জ্জে,—আমার হয়ে আপনি কতকগুলি কাজ করবেন মাত্র। আপনার দরকারী যে সব হিসাবপত্র তা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আর যদি কখনও কিছু আবশ্যক হয় আমার নিকট হতে চেয়ে নেবেন। আপনি দেখবেন যে, আপনার অধীন কর্ম্মচারীরা কোনরূপ চুরি না করে। একঘণ্টা বাদে আমরা একসঙ্গে ব্যাঙ্কে যাব। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার ইচ্ছা যে, আপনি আমাদের বাড়িতেই থাকুন।"

দেবকুমার। এতে আমার নিজেরই সুবিধে। এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

মিঃ আয়ার। আজকালকার ছেলেরা কিছু স্বাধীনভাবে থাকতে চান, সেইজন্য সহজে এ প্রস্তাব করতে সাহস হয় না। চলুন আপনাকে মিস্ আয়ারের সহিত পরিচয় করে দিই। পরে আমরা গাড়ি করে ব্যাঙ্কে যাব।

এই বলে' তাঁরা ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেবকুমারকে মিস্ আয়ারের সহিত পরিচয় করে দিলেন। যথাবিধি অভিভাষণের পর সকলেই উপবেশন করিলেন। মিষ্টার আয়ার কন্যাকে বললেন, "মিঃ বোসকে তুমি অভ্যর্থনা কর। আমি প্রস্তুত হয়ে আসি।" বলিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

মিস্ আয়ার কহিলেন "আমি অনেক সাধারণ কাজে হাত দিয়েছি আপনাকে আমার অনেক সাহায্য করতে হবে।"

দেবকুমার। নিশ্চয়ই করব। আপনি সৎকাজে হাত দিয়েছেন, আমার যথাসাধ্য আমি আপনাকে সাহায্য করব।

এমন সময়ে মিষ্টার আয়ার কাপড় পরিয়া আসিলেন। মিস্ আয়ার কহিলেন; "বাবা মিষ্টার বোসকে আমি আমার কাজের কথা বলছিলাম, ইনি যতটা পারেন আমার সাহায্য করবেন বললেন।"

মিষ্টার আয়ার। তুমি এঁকে একটু বিশ্রাম করিতে দাও। তোমার কাজের কথা ক্রমে বোলো।

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে গাড়ী চড়িয়া ব্যাঙ্কে যাত্রা করিলেন।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে সম্মুখ দিয়া একজন লোক যাইতেছে দেখিয়া মিষ্টার আয়ার রূঢ়স্বরে তাহাকে তেলেগু ভাষায় কি বলিলেন। সে লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত যোড় করিয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সে অন্যদিকে চলিয়া গেল। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "এ লোকটি কে? কি করেছিল?"

আয়ার। ও পারিয়া, সদর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাই ধমক দিলাম।

দেবকুমার। আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে—মাপ করবেন। রাস্তা দিয়ে যাওয়ায় দোষ কি?

মিষ্টার আয়ার হাসিয়া বলিলেন, "আপনি এখানকার রীতি-নীতি কিছুই জানেন না। থাকতে থাকতে ক্রমে জানতে পাবেন। মান্দ্রাজে পারিয়া নামে একজাতি আছে, সকলেই তাদের ঘৃণা করে, কেহ তাদের স্পর্শ করে না,—ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। এদের আচার-ব্যবহার দেখলে বাস্তবিকই ঘৃণা হয়। এরা খুব মদ খায়, বড্ড অপরিস্কার থাকে। মান্দ্রাজে এরা সাধারণ রাস্তা দিয়ে যেতে পারে না। এদের জন্য স্বতন্ত্র রাস্তা আছে। সোজা হবে বলে ঐ লোকটা এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আমি ধমক দিতেই অন্য রাস্তায় চলে গেল।"

দেবকুমার। এদেশে মানুষ মানুষকে এমন ঘৃণা করে! বাংলাদেশেও চণ্ডালদের ঘৃণা করে বটে, কিন্তু এতদূর নয়।

মিঃ আয়ার। এখানে ঘৃণা করবার অনেক কারণ আছে। সহরের যত চুরি অধিকাংশ এদের দ্বারাই হয়। এরা মদ খায় এবং অতিশয় হীন অবস্থায় থাকে। কিন্তু এখানকার ভদ্রলোকেরা এদের প্রতি খুব অত্যাচারও করেন।

দেবকুমার। শিক্ষিত লোকেরা এদের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করেন না?

মিঃ আয়ার। হাঁ, চেষ্টা হয় বই কি। প্রতি বৎসর বক্তৃতা হয়, পারিয়াদের জাতিতে তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু বক্তৃতা পর্য্যন্ত হয় আর কিছু হয় না।

দেবকুমার। এরূপ অবস্থা বড়ই দুঃখজনক।

দেবকুমার মিঃ আয়ারকে আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য যতদূর চেষ্টা করিতে পারেন তাহা করিবেন। যাহা হউক, এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ আয়ার তাঁহাকে ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কোম্পানীর কাজ বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, "আপনার নিকট দেখতে চাই সততা। পূর্ব্বে এই কাজে যিনি ছিলেন, তিনি হিসাবপত্রে গোলমাল করায় তাঁকে কর্ম্মচ্যুত করতে হয়েচে। সৎ বলেই আমি আগ্রহ করে আপনাকে আনিয়েছি। আপনি একপ্রকার আমার এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের কাজই করবেন। এর জন্য ১০৩৲ করে মাসে পাবেন। কোম্পানীর ডিরেক্টারের সহিত আপনার পরিচয় করে দেব। বীণাপুরমের রাজা একজন ডিরেক্টার। তিনি কেমন ভদ্র, আলাপ করলেই তা বুঝতে পারবেন।

১৩

পারিয়াদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ও তাহাদের বিবরণ শুনিয়া দেবকুমারের মনে তাহাদের উন্নত করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন হায় হায়! আমাদের দেশেও ত আমার প্রায় এই অবস্থা। ইহারাও ত মানুষ। শেয়াল কুকুর রাস্তায় চলিতে পারে, কিন্তু মানুষকে রাস্তায় চলিতে দিবে না। শেয়াল কুকুর হইতেও তাহারা অস্পৃশ্য!

তিনি সর্ব্বপ্রথমে তেলেগু ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যদিও সংস্কৃত বা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত কোন ভাষার সহিত এভাষার সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহা অতিশয় কঠিন, তথাপি তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ও লোকের সহিত কথা বলিয়া দুই মাসের মধ্যেই অনেকটা শিখিয়া ফেলিলেন।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। এখন পারিয়াদিগের মধ্যে কাহারও অসুখ হইলে তিনি তাহাদিগকে দেখিতেন ও ঔষধ দিতেন। প্রথমে ইহাতে তিনি অত্যন্ত বাধা পাইয়াছিলেন। কেন-না অশিক্ষিত পারিয়াগণ প্রথমে কিছুতেই ঔষধ খাইতে চাহে নাই। তাহারা বলিত, "আমরা হিন্দু, কখনও

খৃষ্টানী ওষুধ খাই নে। ওষুধ খেলে দেবী আমাদের উপর অত্যন্ত রাগবেন, তাহা হলে আমরা রোগ হতে আর বাঁচব না!” তাহারা মনে করে যে দেবীর ক্রোধেই রোগ হয়, এবং রোগ আরোগ্য করিবার জন্য কেবল দেবীকেই পূজা দিতে হয়। যাহা হউক, অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে তিনি ঔষধ খাইতে সম্মত করিতে পারিয়াছিলেন।

দেবকুমার পারিয়াদিগের মধ্যে দেখিলেন যে তাহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহা মদ খাইয়া ব্যয় করিয়া ফেলে। ঘরে খড় নাই, পরিধানের বস্ত্র নাই, আহার অতি সামান্য এবং শুইবার বিছানা হয়ত কিছু নাই। কিন্তু মদে সব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেবকুমার এক নূতন ভাবে তাহাদিগের মধ্যে কাজ করিতে লাগিলেন। পারিয়াদিগের প্রত্যেক বস্তীর এক একজন মণ্ডল আছে। তিনি প্রথমে একজন মণ্ডলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া মদ্যপানের অপকারিতা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মণ্ডল যখন মদত্যাগ করিতে সম্মত হইল, তখন তাহার বস্তীর সকল লোককে ডাকিয়া উভয়ে মদ্যপানের অপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল হইল। মণ্ডলকে মদ ছাড়িতে দেখিয়া ও উহার অপকারিতা বুঝিয়া সকলেই মদ ছাড়িতে প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু এই মদ্যপান পরিত্যাগের ফল আরও আশ্চর্য্য! যাহাদের ভাঙ্গা ঘর ছিল তাহারা তাহা মেরামত করিল, যাহাদের খড়ের ঘর ছিল, তাহাদের টিনের ঘর হইল, এবং অপরে শীঘ্রই টিনের ঘর করিবার জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিল। পরিশ্রমপ্রিয় পারিয়া রমণীগণ প্রফুল্লচিত্তে গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহারা যখন অনেকে একত্র হইয়া গ্রীবার পশ্চাৎদিকে কবরী বন্ধন করিয়া অনাবৃত মস্তকে হাস্যপরিহাসের সহিত জল আনিতে যাইত, এবং কলসী জলপূর্ণ করিয়া মস্তকের উপর রাখিয়া সহাস্যমুখে গৃহে আসিত, তখনকার সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হইত। তাহাদের বস্ত্র পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত হইল, গৃহ নূতন লোহিতবর্ণ মৃত্তিকালিপ্ত হইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বালক বালিকারা পর্য্যাপ্ত আহার পাইয়া আনন্দের সহিত শ্রেণীবদ্ধ গৃহশ্রেণীর মধ্যস্থিত অঙ্গনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। এইরূপে এক পল্লীর দৃষ্টান্তে অপর পল্লী সংশোধিত হইতে লাগিল।

দেবকুমার ইহাদের জন্য কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া একদিন এক মণ্ডলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

মণ্ডল। বাবু তোমার এ চেষ্টা বৃথা। তোমার উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু তোমার

স্কুলে পড়িবে কে ? পায়রিঙ্গিরা স্কুল করে কয়েকজনকে খৃষ্টান করে নিয়েছে, সেইজন্য আর কেহ স্কুলে ছেলে দিতে চায় না।

দেবকুমার। পায়রিঙ্গী কারা ?

মণ্ডল। তোমরা যাকে ফিরিঙ্গী বল, আমরা তাদের পায়রিঙ্গী বলি। ইংরেজেরা এদেশে পারিয়া বিবাহ করে যেসকল সন্তান হয়, আমরা তাদেরই-পায়রিঙ্গী বলি। তোমরা না-জেনে তাদিগকে বল ফিরিঙ্গী।

দেবকুমার। সেকথা যাক। তুমি ত আমাকে জান, আমি ত আর খৃষ্টান করতে চাই না। সেকথা কি তুমি সকলকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না ?

মণ্ডল। বাবু তুমি নিজেই বুঝে দেখ, আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কি করবে, কে তাদের কাজ দেবে। যারা আমাদের ছায়া মাড়াতে চায় না সরকারী রাস্তা দিয়ে চলতে দেয় না, তারা কি আমাদের কোন কাজ করতে দেবে ? আমাদের চোখ ফুটিয়ে কেবল অসন্তোষ বাড়াবে। এখন তোমরা মা'র,—শেয়াল কুকুরের মত তাড়াও—আমরা সব সহ্য করচি। কিন্তু তখন এ অবস্থা সহ্য করা বড়ই কষ্টকর হবে।

দেবকুমার এ কথার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে কেবল বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! ইহাকেই কি হিন্দু সভ্যতা বলে ? মানুষের উপর মানুষ কি এমন অত্যাচার করতে পারে ? আমরা ইংরাজ-রাজের নিকট কত অধিকারই প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু মানবের সামান্য অধিকারও আমরা দিতে চাহি না। ইহাতেই বুঝা যায় যে, আমরা কি অপদার্থ !

মণ্ডল আবার কহিল। "বাবু তোমরা আমাদের ঘৃণা কর বলেই আমাদের মেয়েদের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। তাদের ঘরে রাখতে পারি নে।"

দেবকুমার। সে কি ? আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারচি নে।

মণ্ডল। ভদ্রলোকেরা প্রকাশ্যে তাদের ঘৃণা করে বটে, কিন্তু যখন তারা কুলটা হয়, তখন গোপনে তাদের ঘরে আসতে ভদ্রলোক দ্বিধা বোধ করে না! যারা পূর্ব্বে ঘৃণা করত তারা এখন আদর করছে দেখে আমাদের ঘরের অনেক মেয়ে কুলটা হওয়াকেই গৌরব মনে করে। আমরা যে তোমাদের নিকট হ'তে দূরে থেকেও, নিরাপদে থাকতে পারি নে।

দেবকুমার। ভগবান তোমাদের উপর মুখ তুলে চাবেন। তোমারা ভাল হও, তোমাদের উন্নতিতে বাধা দেয় কার সাধ্য ?

মণ্ডল। বাবু, দুঃখের কথা আর কি বলব ? এই পারিয়া যখন খৃষ্টান হয়ে

পায়রিঙ্গী হয়, তাহার নাম একটা 'ম্যানুয়েল' 'স্যামুয়েল' রাখে, তখন তারা তাকে "আসুন, বসুন" বলে চেয়ার দেয়। কিন্তু যারা পৈতৃক ধর্ম্ম নিয়ে আছে তাদের ছায়াও মাড়ায় না। সেইজন্য আমরা হিন্দু থাকতে চেষ্টা করলে কি হবে! যারা একটু নিজের অবস্থা বুঝতে পারে, তারাই খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এ সব ত ভদ্রলোকের দোষেই। কিন্তু আমরাও ভদ্রলোকের উপর এর প্রতিশোধ লই।

দেবকুমার। সে কি রকম? তোমরা কিসে প্রতিশোধ লও।

মণ্ডল। না বাবু, সেকথা তোমাকে এখন বলব না। যদি সময় হয় পরে বলব। তুমি আয়ারের বাড়ী থাক না?

দেবকুমার। হাঁ।

মণ্ডল। যাহা হউক, সেকথা পরে বুঝবে।

দেবকুমার। তা যেন হল। কিন্তু মণ্ডল, তুমি আমার স্কুলের বন্দোবস্ত করে দাও। তুমিও ত বললে, লেখাপড়া না শিখলে, নিজের অবস্থা পর্য্যন্ত বুঝা যায় না। কিন্তু লেখাপড়া শিখলে তোমাদের নিজেদের কাজ কর্ম্ম ত ভাল করে করতে পারবে।

মণ্ডল। বাবু, তুমি বড় ভাল লোক। আমি চেষ্টা করব, দেখি কতদূর কি করতে পারি। তোমাকে আমি পরে সব বলব।

দেবকুমারের চেষ্টা ও মণ্ডলের সহায়তায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পারিয়া শিক্ষক ব্যতীত অপর কোন শিক্ষক কাজ করিতে স্বীকার করিল না বলিয়া একজন খৃষ্টান পারিয়া শিক্ষককে প্রথম বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া হইল। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, তিনি যেন স্কুলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার না করেন। দ্বিতীয় স্কুলের জন্য একজন পারিয়া হিন্দু শিক্ষকই পাওয়া গিয়াছিল।

মিঃ আয়ারকে এসকল কথা বলিলে তিনি উৎসাহ দিলেন না, বরং অনুযোগ করিতে লাগিলেন। মিঃ আয়ার বলিলেন, "তুমি এতবড় একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে পারিয়াদের সহিত বেশী মিশলে তোমার পদের ক্ষতি হবে। এছাড়া তুমি যদি ওদিকে এত সময় দাও তা হলে কাজ করবে কি রূপে? তুমি কিছু মনে করো না, আমি তোমার ভালর জন্যই বলচি।"

দেবকুমার। আমি কাজের কোন ক্ষতি করি নে। অবসর সময়ে এই কাজ করে থাকি। দেবকুমার একটু দৃঢ় ভাবেই বলিলেন, "এদের জন্য কোনরূপ চেষ্টা

২৭

করা কি অন্যায় ? দেখুন এদের এমনই দুর্ভাগ্য যে কেউ এদের সাহায্যও করতে চায় না। আমি বিদেশী বলে এদের মধ্যে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েচেন। স্কুলের জন্য কিছু চাঁদা আপনাকে দিতে হবে। অনেকে দিতে স্বীকৃত হয়েচে।"

মিঃ আয়ার একটু সুর বদলাইয়া বলিলেন,—"সকল সৎ কার্য্যেই আমার উৎসাহ আছে। চাঁদা অবশ্যই দেব। কিন্তু পারিয়া গুলো এমন হীন যে, ওদের উন্নতির কোন আশা আছে বলে আমার মনে হয় না। সেইজন্য তোমাকে এ বৃথা চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হতে বলছিলাম।" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। (বি এ)

বিবিধ

বাঙ্গলী সৈন্যের অভ্যর্থনা। সৈন্যদলে প্রবেশের অধিকার পাইয়া বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। দেশের জন্য বাঙ্গালী জীবন বিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ নহে ; বাঙ্গালীর যুবকসম্প্রদায় আহ্বানমাত্র সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

বিদায়-মহোৎসব সভায় ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক সৈন্যসংগ্রহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"আমাদের আর সবে মাত্র ৭২ জনসৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু সৈন্য দলে আমরা তদপেক্ষা বেশিসংখ্যক যুবককে প্রথমত ভর্ত্তি করিব, কারণ ডাক্তারী পরীক্ষায় কেহ কেহ অযোগ্য প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু অধিকসংখ্যক যুবা পাইতে আমাদের কোন মুস্কিল হইবে না, এখনও আমরা মফঃস্বলের যুবাদিগকে তালিকা-ভুক্ত করি নাই। যাঁহারা সৈন্যদলভুক্ত হইতেছেন সেই সকল যুবাদিগের অনেকেই সমৃদ্ধ জনক জননীর পুত্র। সকলেই সুশিক্ষিত, কেহ কেহ মেডিকেল কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, আবার কেহ কেহ উচ্চ বেতনের পদ-ত্যাগ করিয়া অত্যল্পবেতনগ্রাহী সৈনিকের ক্লেশ স্বীকার করিতে চলিলেন, রায় যদু-নাথ মজুমদার বাহাদুরের পুত্র হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছিলেন, তিনি পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া রণক্ষেত্রে যাইতেছেন। জমিদার মিঃ এস, রায় ইংলণ্ডে টেরিটরিয়েল সৈন্যদলে ছিলেন, সংপ্রতি তিনি তাঁহার পরিজনবর্গ, পত্নী ও নবজাত পুত্রকে ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী সৈন্যদের প্রথম দলে যোগ দিয়াছেন।

যে ভাব এই সকল যুবাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা অতি মহৎ। পার্থিব লাভ-ক্ষতি, মাহিয়ানা প্রভৃতি তুচ্ছ প্রশ্নের প্রতি তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করেন তাই।

বাঙ্গালী সৈন্য ও বাঙ্গালী নারী। আজ বাঙ্গালীর বহুকালের "আশার কথা," বহুকালের "মধুর স্বপন" সফল হইতে চলিয়াছে—বাঙ্গালীর সুদিন উপস্থিত। আজ বাংলার জননী তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হাস্যমুখে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া বাঙ্গালীর মিথ্যা কলঙ্ক ঘুচাইতেছেন। আর বাঙ্গলী নবজীবন লাভ করিয়া, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রাজার জন্য, সত্যের জন্য, দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছেন, এ সকল স্মরণ করিলেও মৃতপ্রাণ জাগিয়া উঠে। (সঞ্জীবনী)

বায়স্কোপ,—এদেশে বায়োস্কোপের প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। না পাইবে কেন? যে বাঙ্গালী অর্থ এবং সুসংস্কার অভাবে গৃহপরিবারে শৃঙ্খলা স্থাপনে অক্ষম, সেই বাঙ্গালী অসার তরল—এমন কি কদর্য্য আমোদের জন্য অতি কষ্টের অর্থও স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিতেছে। সাধারণের রুচির অনুকূল কতক-গুলি ইউরোপীয় চরিতের বীভৎস দৃশ্যই অধিকাংশ বায়োস্কোপে প্রদর্শিত হয়। এই দৃশ্য দর্শনে একদিকে যেমন লোকে মনে করিতেছে বুঝি ইংরাজ চরিত্রই এইরূপ; অপর দিকে ঐ সকল দৃশ্য পুনঃ পুনঃ দর্শনে অজ্ঞাতসারে জনসাধারণের মধ্যে এমন বিষাক্ত ভাব প্রবেশ করিতেছে যে, তদ্দ্বারা চরিত্রের পতনকে সহজ করিয়া দিতেছে। এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যক, যাহাতে এই স্রোত আবাধে বৃদ্ধি পাইতে না পারে। বায়োস্কোপের দ্বারা উভয় জাতির পক্ষেই অকল্যাণসাধন করিতেছে।

স্বপ্ন—রাজসাহী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র রংপুর-নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ দের মাতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র জলে ডুবিয়া মারা যাইতেছে। তিনি ব্যাকুল হইয়া পুত্রকে পত্র লেখেন এবং পরে টেলিগ্রাম করেন যেন পুত্র পদ্মায় স্নান করিতে না যান। দুই তিন দিন পুর্ব্বে স্নেহময়ী মাতার ঐরূপ পত্র এবং টেলিগ্রাম পাইয়াও যুবকটি বন্ধুগণের অনুরোধে, গুরুজনের আজ্ঞার মূল্য সম্বন্ধে বিষম ভ্রম বশত ২৬শে জুলাই বুধবার পদ্মা নদীতে স্নান করিতে যায়। এবং প্রবল স্রোতে ভাসিয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যে ঘটনা আসিতেছিল মাতার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া তাহার ছায়া পড়িয়াছিল। (কমিং ইভেণ্টস ফাষ্ট দেয়ার স্যাডোজ বিফোর) দেশীয় ভাবে বলা যায়— প্রীতির যোগে মাতারা অনেক সময়ে দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েন সর্ব্বজ্ঞের চরণে

প্রীতির কাতরতায় হৃদয় মিলনের ক্ষণে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সময়ে সময়ে আসিয়া পড়ে। (এডুকেশন গেজেট)

রেলগাড়ীতে ধূমপান ও আইন। ধূমপানের স্বাস্থ্য-হানিকর কুঅভ্যাস ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। রেলগাড়িতে উঠিয়াই অল্পবয়স্ক বালক হইতে অতিবৃদ্ধ পর্য্যন্ত অনেক যাত্রীই ধূমপান করিতে সুরু করিয়া থাকে, ইহাতে অন্যান্য সহযাত্রীগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ধূমপায়ীরা সাধারণত যে পরিমাণে ধূমপান করে, রেলগাড়ীতে কোথাও যাইতে হইলে সেমাত্রা বিশেষ বাড়িয়া যায়। অনেকে যাত্রা সুখকর করার জন্য পূর্ব্ব হইতে সিগারেট, সিগার বা তামাক ইত্যাদি অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অপরের অসুবিধা ঘটাইয়া রেলগাড়ীতে ধূমপান যে আইন অনুসারে নিষিদ্ধ এবং এই আইন ভঙ্গ করিলে যে দণ্ড হইতে পারে এ কথা জানা না থাকাতে ধূমপায়ীরা সহযাত্রীদের কষ্টভোগ করাইতে দ্বিধা বোধ করে না। সহযাত্রীরাও অজ্ঞতাবশত, কষ্ট হইলেও কিছু বলিতে সাহস করেন না, মনে করেন যে ধূমপায়ীরাও যখন সমান অর্থ দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়াছে, তখন আমাদের নিষেধ করিবার কি অধিকার আছে। অসুবিধা হইলে রেলগাড়ীতে যে কোন যাত্রীই অপর যাত্রীর ধূমপান বন্ধ করিয়া দিতে পারেন তাহা ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে আইনের নিম্নলিখিত ধারা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

Any person smoking without the consent of his fellow passengers, in a compartment or in a carriage not specially provided for the purpose is liable to a fine which may extend to *Twenty Rupees.* Any person who persists in so smoking after being warned to desist may be removed by any Railway servant from any such carriage and from the premises of the Railway. (Sec. 110 of Ry. Act.)

"কোন যাত্রী অপর সহযাত্রীর অমতে রেলগাড়ীর মধ্যে (নির্দ্দিষ্ট গাড়ী ব্যতীত) ধূমপান করিলে, তাহার ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। যদি কোন লোক নিষেধ করা সত্ত্বেও ধূমপান করিতে থাকে তাহা হইলে রেলের যে-কোন কর্ম্মচারী তাহাকে গাড়ী হইতে এমন কি ষ্টেশন হইতেও বাহির করিয়া দিতে পারিবে।"—ইহাই উক্ত আইনের মর্ম্ম।

বিভিন্ন রেলের Time Tableএর নিয়মাবলীর মধ্যেও এই বিধি লিখিত আছে। ধূমপায়ীরা যেন এদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং অপর যাত্রীর অসুবিধা না

ঘটাইয়া রেলপথে ভ্রমণ করেন। কলিকাতার ট্রামেও সাম্নের দুই সারিতে ধূমপান নিষিদ্ধ, সেদিকেও ধূমপায়ীদের লক্ষ্য রাখা উচিত। (স্বাস্থ্য সমাচার)

বাঙ্গালীর এত রোগ কেন—এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ মনে লাগিয়াছে। আমরা সেই প্রবন্ধের কতক অংশ প্রকাশ করিলাম—

"কেন এমন হইল? বঙ্গদেশে এত রোগের বৃদ্ধি হইল কেন? এই যে তোমার আশে পাশে এত লোক—উহাদের স্বাস্থ্য সম্পদের গর্ব্ব কোথায় গেল? বাঙ্গালীর শরীর এমন ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়িল কেন? বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া এসিডিটি ও ডায়েবিটিসের প্রভাব কেন? ইহার উত্তরে তোমরা যাই বল না কেন, আমাদের মনে হয়—এ রোগ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ—দেশোচিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন।"

"এখন আফিস আদালত, দোকান পসার, হাট বাজার সমস্তই মধ্যাহ্নকালে হইয়া থাকে। সূর্য্যের দীপ্তি যত বৃদ্ধি পায়—লোকের শারীরিক পরিশ্রমও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে! কর্ম্মক্ষেত্রের তাড়নায় লোকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেক না হইতেই আহার করিতে বাধ্য হয়। এই পূর্ব্বাহ্নে আহার—অম্ল ও অজীর্ণ রোগের কারণ নয় কি?

তারপর বিশুদ্ধ বায়ু। বাঙ্গালীর দেহে আর বিশুদ্ধ বায়ুর স্পর্শে আনন্দ-পুলক সঞ্চার করে না। মধ্যাহ্নের কিরণ সন্তপ্ত প্রভাবের সময়—বাঙ্গালীকে জুতা, মোজা, গেঞ্জী, জামা, চোগা চাপকান পরিয়া আহারের অব্যবহিত পরেই—কর্ম্মভূমে প্রবেশ করিতে হয়। বস্ত্রস্তূপের গরমে দেহ গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠে! এ অবস্থায় পরিপাক যন্ত্রটা কতদূর উদ্বেল হইয়া পড়ে, তাহা আর কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। রাত্রের আহারেও ঐরূপ গোলযোগ! সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, কুপিত পিত্তের প্রসাদে নৈশ আহার অম্লাজীর্ণ বিষে পরিণত হয়। তাই এখন বাঙ্গালীর দেহে—এত অজীর্ণ এত উদরাময়, এত গ্রহণী, অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধতার প্রাদুর্ভাব।" (মাসিক-সম্মিলনী)

খাদ্য-বিচার। প্রধানত যাহারা আলু খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা চঞ্চল, হাস্যপ্রিয় উৎফুল্ল ও অব্যবস্থিত চরিত্রের হয়। দেড় পোয়া দুধ ও এক পোয়া খেজুর মিশাইলে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়। প্রত্যহ একই রকম খাদ্য আহার করিলে শরীরের ভাল রকম পুষ্টি হয় না। যাহাদিগের সহজে সর্দ্দি হয়

বা ঠাণ্ডা লাগে তাঁহাদিগের অধিক লবণ খাওয়া উচিত নহে। এক গ্লাস গরম দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক উত্তেজক ও বলকারক পদার্থ আর নাই। যাঁহারা অধিক আহার করেন তাঁহারা দীর্ঘজীবী হন না, পরিমিত আহার ও আহারের সময় খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। শাকসব্জীতে যে লবণ আছে তাহার জন্যই উহা উপকারী। সেজন্য তাহা জলে সিদ্ধ না করিয়া বাস্পযোগে সিদ্ধ করিয়া আহার করিতে হয়। কলার মধ্যে অনেক শর্করা আছে বলিয়া উহা উৎকৃষ্ট খাদ্য। সাধারণ কলায় ৬ ভাগ মেদ ও ৮৯ ভাগ শর্করা আছে। (ঐ)

তোমার পথ

বাসনার দীপ নিভায়ে তোমার
ধেয়ানে রহিব আমি,
সে পথ আমায় দাও নাই জানি,
হে মোর জীবন-স্বামী!
বাসনা-প্রদীপ-পঞ্চ জ্বালায়ে
বাঁধিয়া গগনতল,
আরতি তোমার নহে নহে প্রভু,
সে যে আরতির ছল।
বিরাটের সনে রাখি আপনারে
যেন ভবে আমি থাকি,
দেওয়া ও নেওয়ার মাঝখানে প্রভু,
যেন তোমারই ডাকি।
তুমি যা দিয়েছ তাই যেন পাই
তার বেশী মোর নয়,
তোমায় স্মরিয়া যাহা পাই আমি
তার বাড়া দুখময়!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

সহযোগী অর্চ্চনা

সহযোগী "অর্চ্চনা" শ্রাবণ সংখ্যায় "কুশদহ"র প্রতিকূলে অন্যায় সমালোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং আষাঢ় সংখ্যা কুশদহে তাহার একটু প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সহযোগী পুনরায় আশ্বিন সংখ্যায় তাহার উপর প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহার উপর আমাদের আর কিছু না বলাই উচিত ছিল, কেন না, আমরা জীবনের প্রথম অবস্থায় মনে করিতাম, মানুষের সম্মুখে সত্য প্রকাশ করিলেই বুঝি মানুষ তাহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু এখন কার্য্যতঃ দেখিতেছি, তাহা নয়; এই যে মানুষের সম্মুখে অহর্নিশি সত্য প্রকাশ হইতেছে মানুষের কর্ণে কোটীকণ্ঠে সত্য ঘোষিত হইতেছে, তবু-ত মানুষ সে সত্য গ্রহণ করে না; কারণ সত্যগ্রহণের উপযোগী অবস্থাও ক্ষমতা তাহার থাকা আবশ্যক। তাই মনে করিয়াছিলাম আর কাগজে-কলমে লিখিয়া কি হইবে ? যদি কখনো সুযোগ ও সুবিধা পাই, দুটি কথা সহযোগী অর্চ্চনা সম্পাদকের পায় ধরিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব—কিন্তু তাহা হইলে একটি অন্যায় হয় এই যে, পাঠক-পাঠিকাগণের মনে ভুল ধারণাটি রহিয়াই যায়। এইজন্য আবার সাদার উপর কালি দিয়া কিছু বলিতে হইল। তবে সকল কথা উল্লেখ করিবার স্থানাভাব; কেবল আসল কথাটাই বলিতেছি, পাঠক পাঠিকাগণ ইহার বিচার করিবেন।

সহযোগী বলিতেছেন, "আংটীর মূল্য" গল্পটি 'অপহৃত' কারণ সমাজপতি মহাশয়ের "বাঘের নখ" গল্পের সহিত উহার মিল আছে। মিল আছে সত্য ;— তাহা হইলেই কি 'অপহৃত' হয় ? এমন কি প্রায়ই হয় না ? সুবিখ্যাত লেখকগণের অনেক লেখার সঙ্গে অন্যের অনেক লেখায় যে মিল হইয়া যায়, অথচ বাস্তবিক তাহা অনুকরণ বা 'অপহৃত' নয়। এস্থলে তাহার একটুও কিন্তু না করিয়া একেবারে সাফ্ 'অপহৃত' কথাটি ব্যবহার করা—আগেই একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা— ইহাতেই বুঝা যায় আমাদের সম্বন্ধে সহযোগীর কিরূপ ধারণা! আমরা বলিতেছি, 'আংটীর মূল্য' গল্পের লেখক আমাদের বিশেষ পরিচিত-বন্ধু; আর আমরা জানি যে, বাস্তবিক তিনি "বাঘের নখ" গল্প অবলম্বন করিয়া অথবা উহার ভাব লইয়া "আংটীর মূল্য" গল্প লেখেন নাই। তবে দুই একস্থানে ভাষায় একটু আধটু মিল আছে বটে। আশ্বিনের প্রতিবাদে সহযোগী যেখানে মিল দেখিয়াছেন কেবলমাত্র সেই স্থানটুকু উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের মনে আরো ভ্রম উৎপাদন করিয়াছেন। কিন্তু সহযোগীর ভ্রম মৌলিক ব্যক্তিত্বের উপর। কতদূর অহংকৃত হইয়া—আপনাকে কতখানি বড় করিলে তবে একজন

ভদ্রলোককে পরিষ্কাররূপে "চোর" (অপহারক) বলা যায় ? ইহাতে কতদূর অপরাধ হয়,—"বিবেকী" না হইলে সে কথা কখনই বুঝিতে পারে না। এই শ্রেণীর জীবদিগকে আমরা আর কিছু বলিতে চাই না।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

এবার ই, বি, এস, রেলওয়ের সেণ্ট্রাল বিভাগে ট্রেণের সময়পরিবর্ত্তনে প্রাতে ৪-৪৮ মিনিটের ট্রেণখানি একেবারে উঠিয়া গিয়া আমাদের বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। যদি গোবরডাঙ্গা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে প্রাতেই বনগ্রামে বা ১০টা ১১টার সময় কোর্টে গিয়া কোন কাজ করিতে হয় তবে তার উপায় নাই। সুতরাং পূর্ব্বদিন গিয়া থাকিতে হইবে, এ-কি সহজ-সম্ভব ? তারপর ৯-১৭ মিনিটের থানিও বনগাঁ লোকাল হইয়া খুল্না যশোহর পৌছিতে কিছু অসুবিধা যে না হইয়াছে এমন নয়। ফলতঃ প্রাতে একেবারেই ট্রেন না থাকা খুব অসুবিধার বিষয় হইয়াছে। আশা করি এ অসুবিধার কথা বুঝিয়া রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্র এ নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার পরিমাণ অনুসারে টাকা নাই, সুতরাং প্রত্যেক ওয়ার্ডের কমিশনারগণ আপনার বাড়ী মজুর খাটাইতে হইলে যেমন যত্ন করেন তদ্রূপ খাটিয়া খুটিয়া রাস্তাগুলির কার্য্য করাইলে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে এবং কাজও ভাল হইতে পারে। এবার কোন কোন ওয়ার্ডে বিশেষত ২নং ওয়ার্ডে রাস্তার কার্য্য তদ্রূপ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

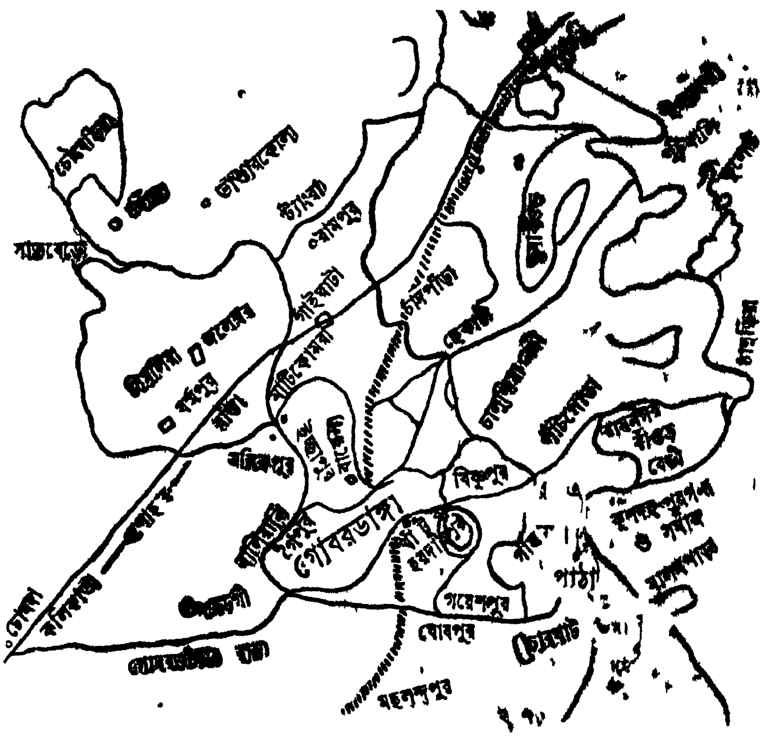
চন্দনপুর হইতে শ্রীযুক্ত হাজারীলাল মিশ্র লিখিয়াছেন, চন্দনপুর-নিবাসী পরলোকগত হরিপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিজয়গোপাল রায় (অমিশ্র অঙ্কে) এম, এস, সি, পরীক্ষায় এবার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিজয়বাবুর জ্যেষ্ঠ [illegible] জয়গোপাল রায় গতবারে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জয় ও [illegible]বাবু চন্দনপুর-নিবাসী সাহিত্যিক কবি শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায়ের কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয়। এই সংবাদটি চন্দনপুরের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্, প্যারাগন প্রেসে
মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

স্থানীয় বিষয় সম্বলিত ধর্ম্ম ও সমাজ পর বিষয়ক

মাসিক পত্র



দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত।

কার্য্যালয় :— ২৮।১, স্যাকরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা
,, সাধারণতঃ ১॥০ দেড় টাকা

প্রতি সংখ্যা
আড়াই আনা

কয়েকটি উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য পুস্তক।

…তী সুখলতা রাও প্রণীত :—

(১) গল্পের বই। **(২) আরো গল্প।**

(১৬ খানি [illegible] ছবি ; ১ খানি রঙিন ছবি ; রঙিন মলাট)।

মূল্য ॥০ [illegible]। মূল্য ॥০ মাত্র।

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত :—

(৩) ছোট্ট রামায়ণ।

(ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পদ্যে রামায়ণ ; ১৬ খানি হাফটোন ছবি ও চার খানি রঙিন ছবি ; রঙিন মলাট)

মূল্য ॥০ মাত্র।

(৪) ছেলেদের রামায়ণ।

(রামায়ণের মূল গল্প; ৮ খানি হাফটোন ছবি, ১ খানি রঙিন ছবি; রঙিন মলাট

মূল্য ॥০ মাত্র।

(৫) ছেলেদের মহাভারত।

(মহাভারতের মূল গল্প ; ৮ খানি হাফটোন ও একখানি রঙিন ছবি আছে)।

কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১।০ মাত্র। কাগজের রঙিন মলাট ১৲ মাত্র

(৬) মহাভারতের গল্প।

(মহাভার[illegible] [illegible]বান্তর গল্পগুলি লইয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে ; ইহাতে [illegible] খানি হাফটোন ছবি আছে ; কাপড়ে বাঁধান)।

মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

"সন্দেশ" কার্য্যালয়,
২২।২, সুকিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ইউ, রায় এণ্ড সন্স,
১০০, গড়পার রোড,
কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্র

"সন্দেশ"

নিতে ভুলে গেছেন নাকি ? আজই "সন্দেশ" কার্য্যালয়ে ১।০ টাকা পাঠিয়ে দিন, না হয় একখানা চিঠি লিখে দিন, ভি-পিতে (১৷৴০ আনা) "সন্দেশ" আসবে। নমুনার দাম ৶০, মাশুল ১০।

টাকাকড়ি, চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

"সন্দেশ" কার্য্যাধ্যক্ষ, ২২-২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

(লেখক লেখিকাগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

"কুশদহ"র কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

১। কুশদহর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, সাধারণতঃ ১৷৹ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যা ৵১০, নমুনার জন্যও ঐ, বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। বৈশাখ হইতে চৈত্র কুশদহর একবৎসর। বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলেও বৈশাখ হইতে কাগজ লইতে হয়।

সতর্কতার সহিত প্রতি মাসে ডাক ঘরে কাগজ পাঠান হয়। তবু কোন কোন গ্রাহকের কাগজ কখন কখন অপ্রাপ্ত সংবাদ পাওয়া যায়। আমরা তদন্তে জানিয়াছি, ডাক ঘরের ত্রুটী ও গ্রাহকগণের অনবধানতা এই দুই কারণেই এরূপ হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসের মধ্যে না পাইলে পর মাসের ১০ই মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে ; বিলম্বে জানাইলে ৵১০ মূল্য দিতে হইবে।

৩। অপরিচিত লেখকের প্রবন্ধাদি সাধারণতঃ প্রকাশ করা যায় না। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান যায় না। যে কোন উত্তর জানিতে হইলে রিপ্লাই পাঠাইতে হয়।

৪। মূল্যাদি সম্পাদকের নামে ২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট কুশদহ কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হয়।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—১ পেজ ৩৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ ২৲ টাকা। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন বদলান হয় না।



কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

দশম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২৫ { প্রথম সংখ্যা

তিনশ' পৈষট্টি দিনে

পয়লা বৈশাখের দিনে একটি মেয়ে বলেন, "কৈ নববর্ষ বলেতো কিছু মনে ছিল না, উপাসনায় গিয়ে নববর্ষের একটা ভাব মনে এলো," কথাটা খুব সত্য, "বর্ষশেষ" বা "নববর্ষ" উৎসবের মধ্যে একটা অনুভূতি—নূতনের আগমন-বার্ত্তা প্রাণে ঘোষিত হয় বটে কিন্তু প্রকৃত নববর্ষ তাঁহার নিকটে নবীন—জীবনপ্রদ, যিনি তিনশ'পৈষট্টি দিন, দিনের শেষে শুনেন "আমি গেলাম" এবং প্রভাতের আগমনে শুনেন, "আমি এলাম," আর ঐ সঙ্গে বিশ্বাসীর কণ্ঠ বলে, "হে প্রভু! অদ্যকার দিন আমার পক্ষে তোমার আশীর্ব্বাদ দ্বারা মণ্ডিত কর, তোমার শক্তিতেই যেন আমার সমস্ত দিনের কার্য্যনির্ব্বাহ হয়, আমার আমিত্ব, অভিমান, অহঙ্কার প্রকাশিত হইয়া যেন তোমার কার্য্যের এবং তোমার সন্তানসন্ততিগণের বিঘ্ন না জন্মায়। অদ্যকার অন্নজল তুমিই দান কর, তাহা পান ভোজন করিয়া যে শক্তি হইবে তাহা যেন তোমারই কার্য্যে অর্পণ করিতে পারি, জগতের কল্যাণ কর, আমার দেশের—জন্মভূমির কল্যাণ কর।" এই তিনশ' পৈষট্টি দিনের প্রার্থনারই একটি নবীন উদ্বোধন, নববর্ষ। নববর্ষ সেই তিনশ'পৈষট্টি দিনেরই আরম্ভ। বিশ্বাসীভক্তের জীবন নিত্য উৎসবময়। নববর্ষ, বিশ্বাসী-ভক্তের জীবনে প্রকৃত নবভাব দান করে। কিন্তু যেখানে জীবনই জাগে নাই, সেখানে "কি বা রাত্র কিবা দিন," ভগবান্ করুন, কুশদহবাসীর প্রাণে নব জাগরণ আসুক। দাসের প্রার্থনা সার্থক হউক, দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হই।

নববর্ষ-বন্দনা *

—o—

নববর্ষ—উপস্থিত

বালক ও বালিকাগণের প্রবেশ।

১ম বালক—তুমি কে ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ ?

২য় বালক—ঠিক যেন একটি জীবন্ত গাছ, দেখতে কি সুন্দর লাগছে।

৩য় বালক—তুমি কে ভাই ?

নববর্ষ—আমি নববর্ষ।

৩য় বালক—তুমিই নববর্ষ ? আজ আমরা নববর্ষকেই খুঁজতে এসেছি।

১ম বালিকা—তোমার গায়ে এত পাতা আর ফুল কেন ? ও তো আমরাও পরেছি। তোমার রাজবেশ নেই ?

নববর্ষ—এই তো আমার রাজবেশ। আমার যিনি প্রভু, তিনি আমাদের এই বেশেতেই সাজাতে ভালবাসেন। চারিদিকে চেয়ে দেখ দেখি, কত বিচিত্র সবুজের শোভায় পৃথিবী কি সুন্দর শোভা ধারণ কোরেছে, বসন্ত এসে দিকে দিকে আমার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা কোরে দিয়েছে, তাতেই তোমরা জানতে পেরেছ যে আমি আসছি,—নয় কি ?

২য় বালিকা—তা ঠিক। আমরা তো তাতেই ঘর ছেড়ে, সবুজ পাতা আর নানাবন-ফুল নিয়ে খেলবার জন্য বাইরে বেরিয়েছি।

১ম বালক—হ্যাঁ ভাই নববর্ষ, তোমার প্রভু আমাদের জন্য কিছু উপহার দিয়েছেন কি ?

নববর্ষ—দিয়েছেন বৈ কি ? তিনি বোলেছেন, পৃথিবীকে আমি বড় ভালবাসি, সেখানকার সকলের জন্য নানা উপহার তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু বোলো, আমার সব দান তাদের পসন্দ না হোলেও, কোনটাও অপ্রয়োজনীয় নয়, তাদের নেবার গুণেই সব সুন্দর হোয়ে উঠ্‌বে।

২য় বালক—ভাই নববর্ষ, তিনি যা পাঠিয়েছেন আমরা তাই নিয়ে খুসী হবো, তাঁর দান হাসিমুখে নিয়ে আমরা ধন্য হবো। এসো ভাই, তুমি আজ আমাদের অতিথি, তোমায় আমরা আদর কোরে আমাদের খেলার সাথী কোরে নিই।

১ম বালক—এসো ভাই নববর্ষ, এই মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিই, এই তোমার যোগ্য উপহার। এস ভাই, আমরা সকলে মিলে নববর্ষকে ঘিরে গান করি।

আজি নববরষের নবীন প্রভাতে নব বন্দনা গানে,
চারিদিক মোরা করিব মুখর, সুমধুর নব তানে।
এস হে নবীন, তরুণ, অরুণ, কিরণোজ্জ্বল প্রাতে,
শ্যাম পল্লবে রচিত মুকুট বাঁধিয়া যতনে মাথে।
শুভ্র মালতী মল্লিকা ফুলে তনু সাজাইয়া যতনে।
এস সুন্দর মানস-হরণ, আমাদের এই ধরণী,
তোমার অমৃত পরশে, নিমিষে হোক্ সুন্দর বরণী,
তোমার তরুণ পরশ লাগুক্ দিকে দিকে জড় চেতনে।
তব বন্দনা পাখীর কণ্ঠে ঐ যে ধ্বনিছে কাননে।
কোথা সে নবীন চিরসুন্দর যাহার আদেশ বহিয়া,
এসেছ হে দূত, ঊর্দ্ধ হইতে মোদের ধরায় নামিয়া,
নত শিরে মোরা নমি তাঁর পায় পূজি সে চিরন্তনে ;—
বরষের যত সব সুখ দুঃখ ধন্য হোক্ এ পরাণে।

শ্রীসরসীবালা বসু।

পল্লী-সমস্যা

—০—

স্যার্ রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে যে পল্লী-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তিনি বলিয়াছেন,—সমবেত চেষ্টা ভিন্ন আজকাল কোনও বিষয়েরই উন্নতি সম্ভবপর নহে। সমবেত চেষ্টার ইচ্ছা পল্লীবাসীর নাই এবং বর্ত্তমানে তাহাদের সে ক্ষমতাও নাই। তবে এখন উপায় কি? উপায় কি নাই? অবশ্য পল্লীবাসীরা নিজেরা কি করিবে, কিরূপে করিবে—তাহাও কিছুই ভাবিয়া পায় না। অথচ কোনও আদর্শও সম্মুখে নাই, যাহার দৃষ্টান্তে তাহা তাহাদের কার্য্যগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এ অবস্থায় দেশনায়কদিগের দ্বারা একটি আদর্শ-মণ্ডলী স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

কোনও একটি গ্রাম পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। সেখানে একটি Joint-stock Company প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। একটি মধ্যম রকম গ্রাম লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেই ভাল হয়। আর সেই গ্রামে দুই একটি এরূপ শিক্ষিত সৎসাহসী লোক থাকা চাই, যাঁহাদের দ্বারা এই কোম্পানীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। এরূপ কোম্পানীর মূলধন ২০,০০০৲ টাকা ধার্য্য করিয়া ৫০০০ অংশে বিভক্ত করা উচিত। প্রত্যেক অংশের মূল্য ৪৲ চারি টাকা। ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে ২৫০০ অংশে বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা অংশ গ্রহণ করিবেন না। কারণ, ইহার উপকারিতা তাঁহারা নিজেরা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না এবং পাছে কোম্পানী নষ্ট হয় বলিয়া তাঁহাদের মনে কিছু আশঙ্কাও যে না থাকিবে, তাহা নহে সেইজন্য প্রথমেই কোম্পানীর সমস্ত অংশ এক সঙ্গে না খুলিয়া অর্দ্ধেক পরিমাণ অংশ বিক্রয় করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। কারণ, কোম্পানীর উন্নতি দেখিলে গ্রামবাসীরা অংশ লইবে। দেশনায়কেরা ইচ্ছা করিলে এক জনে বা দুই জনেই সমস্ত অংশ ক্রয় করিতে পারেন বটে ; কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সফল হইবে না। স্থানীয় লোকের মধ্যে বা নিকটস্থ সহরবাসীদের নিকট অধিকাংশ অংশ বিক্রয় করার চেষ্টা করিতে হইবে।

১০,০০০৲ টাকা লইয়া প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথমেই গ্রামের পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করা উচিত। উক্ত কোম্পানী গ্রামবাসীদের নিকট হইতে পুষ্করিণীর মৎস্য ধরার স্বত্ব লইয়া ঐ পুষ্করিণী সংস্কার করিবেন ; এবং উক্ত পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ করিবেন। ইহাতে মূলধনের অবনতি হইবে না ; বরং কোম্পানী ইহা দ্বারা লাভবান হইবেন। যখন ১, গ্রামবাসীরা দেখিতে পাইবে যে, এই কোম্পানী লাভবান হইতেছে, তখন তাহারা কোম্পানীতে অংশ গ্রহণ করিবে। ইহা দ্বারা গ্রামের মৎস্যকষ্ট নিবারণ হইবে, পানীয় জলের সুবিধা হইবে এবং পুষ্করিণীর মাটি দ্বারা পল্লীবাসীদের বাড়ীর নিকটের অনেক ডোবা পূরণ হইবে। এখন কথা হইতেছে যে, হয় তো অনেকে তাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন পুষ্করিণীর স্বত্ব ছাড়িতে না চাহিতে পারেন। অথচ হয় তো তাঁহাদের উক্ত পুষ্করিণীর সংস্কারের ক্ষমতাও নাই। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী ঐ পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া দিয়া স্বত্বাধিকারীর সহিত এরূপ চুক্তি রাখিতে পারেন যে, যদি তিনি নির্দ্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে নির্দ্ধারিত সুদ সহ টাকা পরিশোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে পুষ্করিণীর স্বত্ব কোম্পানী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন। যত দিন তিনি টাকা পরিশোধ করিতে না পারিবেন, তত দিন পুষ্করিণীর মৎস্য ধরার স্বত্ব কোম্পানীর হাতে থাকিবে। লাভের দিক্ না দেখিলে কোনও লোকই কোনও কার্য্যে যোগ দিবে না। এই কার্য্য দ্বারা প্রথম প্রথম সমবেত চেষ্টার আরম্ভ হইবে। সমবেত চেষ্টার ফলে সমবেত চেষ্টার গুণ উপলব্ধি হইবে।

কোম্পানীর দ্বিতীয় কার্য্য হইবে—ঐ গ্রামের ঋণ-ভারগ্রস্ত দুই চারি জন লোককে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া, এবং তাহাদের কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে খরিদ করিয়া লইয়া তাহাদিগকে মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করা। সকলেই অবগত আছেন যে, কৃষকেরা যখন তাহাদের কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি মহাজনের নিকট বিক্রয় করে, তখন মহাজনেরা তাহাদের প্রাপ্য হইতে 'ঈশ্বর-বৃত্তি' বলিয়া কিছু কিছু করিয়া কাটিয়া লন। বাংলা দেশের মহাজনদিগের গদিতে যথেষ্ট টাকা ঈশ্বর-বৃত্তি খাতে মজুত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কোনও কোনও স্থানে বারোয়ারী প্রভৃতি হয়। কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় হয় না। এখন অনেক স্থল হইতে সে বারোয়ারীও উঠিয়া গিয়াছে। মহাজনেরা এখন যাহা দান করেন, প্রায়ই তাহা ঈশ্বর বৃত্তির তহবিল হইতে। কোম্পানীও যখন কৃষকদিগের নিকট হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিবেন, তখন ঈশ্বর-বৃত্তি কাটিয়া লইবেন। কিন্তু উক্ত ঈশ্বর-বৃত্তি তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির নামে আমানত জমা রাখিবেন; তাহার উপর সুদ চলিবে। এইরূপ করিলে প্রত্যেক বৎসরেই কৃষকদিগের কিছু কিছু জমা হইবে। কোম্পানী যে সমস্ত দ্রব্যাদি খরিদ করিবেন, তাহা যদি তাঁহারা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, তবে তাহা হইতে যে লাভ হইবে, তাহার ষোল আনা অংশের এক অংশ কৃষকের নামে উক্ত কোম্পানীতে আমানত জমা করিয়া রাখিলে আরও ভাল হয়। দুই চারি জনের অবস্থার উন্নতি দেখিলে, অন্য কৃষকেরাও তাহাদের ন্যায় কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করিবে।

তৃতীয়তঃ, কোম্পানী উক্ত গ্রামে লবণ, কাপড়, মশলা, কেরোসিন, ঘৃত, চাউল প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কি পরিমাণে লাগে, তাহা অবগত হইয়া যদি সেই পরিমাণ জিনিস আনাইয়া রাখেন এবং অল্প লাভে উহা

গ্রামবাসীদের নিকট বিক্রয় করেন, তাহা হইলে কোম্পানীরও লাভ হইবে, গ্রামবাসীদেরও সুবিধা হইবে। ইহার পর কোম্পানীর কার্য্যের উপর লোকের শ্রদ্ধা হইলে গ্রামের সর্ব্ববিধ আবশ্যক দ্রব্যই কোম্পানী ভাণ্ডারে রাখিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা কোম্পানী লাভবান হইবেন এবং গ্রামবাসীরাও লাভবান হইবে। এইরূপ করিলে ক্রমে সমবেত চেষ্টার প্রবৃত্তি গ্রামবাসীদের মধ্যে আসিবে। যখন গ্রামবাসীরা দেখিবে যে, কোম্পানীর অংশ লইলে লাভবান হওয়া যায়, তখন সকলেই কোম্পানীর অংশ গ্রহণ করিবে। কোম্পানীর উপর লোকের বিশ্বাস হইলে গ্রামের অনাথা বিধবা প্রভৃতির যাহাদের যাহা কিছু মজুত আছে, তাহারা উক্ত কোম্পানীতে আমানত রাখিবে। তখন কোম্পানীর কোনও বৃহৎ কার্য্যের জন্যও অর্থের অভাব হইবে না; পরন্তু উক্ত গ্রামের কেবল একমাত্র কোম্পানীই মহাজন থাকিবে। তারপর কার্য্য হইবে—কোম্পানীর একটি তালিকা প্রস্তুত করা। গ্রামে কার্য্যক্ষম অথবা নিষ্কর্ম্মা ও স্বল্পকর্ম্মা লোকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা এবং তাহারা কে কি কার্য্যের উপযোগী, তাহা নির্দ্ধারিত করা। প্রত্যেক লোককেই তাহার অবস্থা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য্যে লিপ্ত রাখিতে হইবে, এবং তাহা হইতে তাহারা প্রত্যেকেই যাহাতে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকদিগকে যে সমস্ত কার্য্যের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করা হইবে, তাহাদিগকে সেই সমস্ত কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য লোক আনাইয়া কোম্পানী তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। যখন লোকে দেখিবে যে, বাড়ীতে বসিয়াই উপার্জ্জন করা যায়, তখন অনেকেই সেই কার্য্যে যোগদান করিবে।

গ্রামের মল-মূত্রাদি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা অতি সহজে হইতে পারিবে। তখন গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার সম্বন্ধেও আর বিশেষ বাধা থাকিবে না। প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট হইতে অবস্থা-বিশেষে ঊর্দ্ধে মাসিক ৵০ এবং নিম্নে মাসিক ৴১০ হিসাবে আদায় করিলে গ্রামে মেথর রাখা যাইতে পারে এবং মল-মূত্র আবর্জ্জনাদি দ্বারা গ্রামের নিকৃষ্ট জমি-সমূহের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিবে।

এইরূপে গ্রামের লোকদিগকে কর্ম্মী করিয়া তুলিতে পারিলে সমবেত চেষ্টায় কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি আপনা হইতেই হইবে। তখন গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, পাঠশালা-স্থাপন, ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠা, বিবাদ-

মীমাংসা প্রভৃতি কার্য্য তাহারা নিজেরাই ব্যবস্থা করিয়া লইবে। লোকের একতা বৃদ্ধি পাইবে। এক সঙ্গে স্বার্থ-সম্পর্কে সর্ব্বদা মিলামিশা করায় পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। গ্রামের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, গ্রামবাসীরাই গ্রামে নির্দ্দোষ উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু এইরূপ আদর্শ প্রথম দেশনায়কদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে গ্রামবাসীরা প্রথমে কোনও কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবে না। সরকার বাহাদুর Co-operative Credit Society প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের উন্নতি-কল্পে চেষ্টা করিতেছেন। * দেশনায়কগণও যদি এইরূপ ধরণের কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ গ্রামের অবস্থার উন্নতি হইবে। সম্প্রতি লাটসাহেব বাহাদুর ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্পর্কে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে গ্রামের পূর্ব্বাবস্থা আবার ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সকলের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে। (সাহিত্য সংবাদ হইতে গৃহীত)

* সরকার বাহাদুরের চেষ্টার সহিত দেশবাসীর সমবেত চেষ্টা মিলিত হইলে সুফল লাভের আশা করা যায়। আজকাল পল্লীগ্রাম একরূপ বাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জলকষ্ট, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি লাগিয়াই আছে। বিত্তশালী ভিন্ন, মধ্যবিৎ ও দরিদ্র গৃহস্থ, অর্থাভাব-নিবন্ধন নগর সহরাদিতে বা স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিবার সুবিধা পান না। সুতরাং পল্লীগ্রামের অশেষ কষ্ট-যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। পল্লীগ্রামের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতে নিম্নশ্রেণীর লোক সংখ্যাই অধিক। পল্লীবাসী কৃষকগণ সবল সুস্থ না হইলে অনেক সময় শস্যাদি উৎপন্নেরও ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং উদ্যোগী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যত্নবান হইলে সুফল লাভের সম্ভাবনা। বক্তার কোনও কোনও মন্তব্যের সহিত ব্যক্তিবিশেষের মতানৈক্য হইতে পারে, তথাপি বিষয়টী উপেক্ষণীয় নহে। ২৪ পরগণা সুখচর পল্লীতে সুপরিচিত রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-বি মহাশয় এইরূপ একটি পল্লীসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি সুখচরে প্রথমে খুব ম্যালেরিয়া ও জলকষ্ট ছিল ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় ও পরিশ্রমে সুখচরের ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, জলকষ্টও অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমরা প্রতি পল্লীর উদ্যোগী ব্যক্তিগণকে রায় বাহাদুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলি। প্রথমে সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা ফললাভ হওয়াও সম্ভব। বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের কমিশনার সহৃদয় ডাক্তার বেণ্টলি বঙ্গের পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বঙ্গের বিভিন্ন পল্লীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বাস্থ্যাদির তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার সহৃদয়তার জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। পল্লীবাসী উদ্যোগিগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহারও সহায়তা লাভ করিতে পারেন। (সাঃ সং সম্পাদক)

প্রায়শ্চিত্ত

(উপন্যাস)

প্রথম

স্বদেশীর হাঙ্গামায় দুইবৎসর কারাবাসের পর, যে দিন রতিকান্ত জেল হইতে মুক্তি পাইয়া আসিল, সেদিন পিতা ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, সব চাইতে আনন্দ হইয়াছিল বুঝি হরদাদার। যে হরদাদাকে সম্পদে, বিপদে, প্রাতে বা রাতে, ঘরে ও বাহিরে, কেহ কখনও হুকা ছাড়া হইতে দেখে নাই, সেই হরদাদা আর সকলের সঙ্গে ষ্টেশনে রতিকান্তকে আনিতে যাইবার সময় হুঁকা লইয়া যান নাই। গোলেমালে তাঁহার সে অশোভন মূর্ত্তি কাহারও চোখে পড়ে নাই, কিন্তু রতিকান্তকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া আলিঙ্গন, প্রণাম, আশীর্ব্বাদের যথোচিত পালা শেষ হইলে পর, ছেলের দল হরদাদার সে বাম হস্তখানির বিসদৃশ রিক্ততায় আগেই নজর করিল। সুরেশ কহিল "এ কি দাদা, মহাদেবের ডম্বুরু কি হারিয়ে গেল? আজ কি সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক ভুল করেছেন? এ তো ভাল লক্ষণ না?"

হরদাদারও এতক্ষণে হুস্ হইল, তিনি কহিলেন "না হে না, এ-টা ভাল লক্ষণই বোলতে হবে, রতিকান্তকে নিতে এসে হুঁকা ভুলে এসেছি, তা ভালই হোয়েছে, হাত আমার খালি যাচ্ছে না"। সমস্ত পথ হরদাদা রতিকান্তকে হাতে ঘেরিয়া আঁকড়িয়া লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন, বাড়ীতে আসিবামাত্র মেয়েরা আনন্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল, হরদাদা সাশ্রুনয়না চিন্তামণিকে কহিলেন,

"এই নাও বৌ মা, তোমার হারানিধি ফিরিয়ে আনলুম। বলেছিলুম তো, কেঁদোনা মা, রতিকান্ত ফিরে আসবেই। জোয়ান বয়েস, রক্ত গরম, তার উপর ঘাড়ে এখনও বোঝা পড়ে নি, ওদের অমন দু একটা ভুল চুক হোয়েই থাকে; আবার তাও বলি, কোম্পানী বাহাদুরকেও একটু তলিয়ে বুঝতে হয়। হত্তুকীচূর্ণ তাঁদেরও একটু খাওয়া দরকার, মাথাও ঠাণ্ডা হবে, ভাল কোরে বোঝবারও শক্তি বাড়বে। রতিকান্তর জন্যেও ঐ ব্যবস্থা—নয় তো রাতে গোটাকতক হত্তুকী ভিজিয়ে রেখো, সকালে উঠে একটু কোরে খেতে দিও, দুদিনে সব ঠিক হোয়ে যাবে।"

হরদাদা নিজের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সম্বল হরিতকীচূর্ণ রতিকান্তের জন্ম ব্যবস্থা করিয়াই সরিয়া পড়িলেন।

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে, পুত্র বিচ্ছেদাকুলা জননী পুত্রকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। কারাবাসক্লিষ্ট সন্তানের বিশুষ্ক ললাট চুম্বন করিয়া মাথার ঘনচুল-গুলির মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে জননীর দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু নিঃশব্দে পুত্রের মস্তকে পড়িল। বাড়ীর আশে পাশে মেয়েরা দাঁড়াইয়া. অশ্রুসজল চক্ষে এ মিলন-দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। হরদাদা সে সকল আর দেখিবার জন্য বিলম্ব করিতে পারিলেন না। বাহিরে নিজের ছোট ঘরটিতে আসিয়া, টিকা ধরাইয়া কলিকায় তামাকু চড়াইয়া, অভিমানিনী হুকা সুন্দরীর সাধ্য সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

দ্বিতীয়

রতিকান্ত আহারান্তে বিছানায় শুইয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পড়িতেছিল। বিচক্ষণ সম্পাদকের বিচিত্র মন্তব্যগুলি যুবকের মনে যে ভাবের উদ্রেক করিতেছিল. উহা পরাধীন জাতির মনের মধ্যে যে কিছুতেই হওয়া উচিত নয়, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

হরদাদার নির্বন্ধাতিশয্যে এবং প্রত্যহ তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে মিথ্যা কথা বলিয়া পাপ সঞ্চয়ের ভয়ে চিন্তামণি পুত্রকে প্রতিদিন প্রাতে হরিতকী ভিজান জল পান করিতে দিতেন। রতিকান্ত হাসিয়া হরদাদার সে মহৌষধি-টুকু পান করিত। হরদাদার স্থির বিশ্বাস ছিল এ মহৌষধির গুণ ধরিবেই।

চিন্তামণি আহারাদি সারিয়া, পুত্রের কাছে আসিয়া সুপারী কাটিতে বসিলেন। তিনটি ছেলের মধ্যে রতিকান্তই কনিষ্ঠ, দু'টি পুত্রবধূ ঘর-সংসার দেখিতেছে,এখন রতিকান্তের বিবাহ দিয়া ঘরের বধূ আনিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। বধূদের এখনও সন্তানাদি হয় নাই, বড় মেয়ের তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বাড়ীর সে অভাব পূরণ করিয়া রাখিয়াছে—চিন্তামণির দুইটি মাত্র কন্যা, অদৃষ্টদোষে বড় মেয়েটি ঐ অপোগণ্ডগুলি রাখিয়া অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন,ছোটটিও অল্পবয়সে একটিমাত্র পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছে।

মা কাছে আসিয়া বসিবামাত্র রতিকান্ত কাগজ রাখিয়া উঠিয়া বসিল, ডালা হইতে কুচা সুপারী তুলিয়া মুখে দিয়া কহিল, এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেল মা? পেট ভরে খেয়েছ তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছ মা।

পুত্রের মমতাপূর্ণ কথায় চিন্তামণির চক্ষে জল আসিল, এ দুই বৎসর পুত্র

বিরহে তিনি যে কেমন করিয়া কাটাইয়াছেন তাহা তাঁহার অন্তর্যামী দেবতাই জানেন। আহার নিদ্রা কিছুই নিয়মিত ছিল না, মানসিক এত উদ্বেগ অশান্তি সত্ত্বেও যে শরীর টিঁকিয়া আছে এই আশ্চর্য্য।

যে রতিকান্ত বাড়ী ফিরিতে একটু বিলম্ব করিলে তিনি পথ চাহিয়া থাকিতেন, কন্যা কমলাকে দেখিতে পাঠাইয়া দুই দিনের বেশী চারি দিন হইলে, পুত্রের জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িতেন, পাশের ঘরে রতিকান্তকে শোয়াইয়া মাঝে মাঝে রাত্রে আসিয়া ভাল করিয়া মশারীটি গুঁজিয়া দিতেন, পাছে মশা কামড়াইয়া, পুত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত করে। গ্রীষ্মের সময় কপালে হাত বুলাইয়া দেখিতেন নিদ্রাবস্থায় ঘামিয়া উঠিয়াছে কি না, সেই রতিকান্তকে দুইবৎসর ছাড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল, সে কি কম দুঃসহ বেদনা। যখন প্রিয়জনের সহিত ইহলোকের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তীব্র বেদনার প্রথম আঘাত অত্যন্ত কঠিন হইলেও শীঘ্রই সহিয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীতে বাস করিয়া দৈব-দুর্ব্বিপাকে যে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহার ব্যথা বড় মর্ম্মান্তিক – বড় সাংঘাতিক। রতিকান্তের বিরহে জননী যে যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন তাহা স্নেহময়ী মাতা ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে? সতীকান্ত, উমাকান্ত মাতাকে কত সান্ত্বনা দিত,তাহাদের মুখ চাহিয়া তিনি কোনও রকমে প্রাণ ধরিয়াছিলেন। শ্রীকান্ত বাবু বৃদ্ধ বয়সে নিজেই এ দুর্দ্দৈব ঘটনায় যথেষ্ট সন্তপ্ত হইয়া, কোনও রকমে দিনাতিপাত করিতেছিলেন,তখন সকাতরা পত্নীকে আর বিশেষ কি প্রবোধ দিবেন? তবে রক্ত মাংসের সম্পর্ক না থাকিলেও, এই হরদাদা পরমাত্মীয়ের কাজ করিয়াছেন। প্রাণস্পর্শী সান্ত্বনা ও আশ্বাস-বাক্যে বাটীর প্রত্যেককেই প্রত্যহ কত মতে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, ভগবান বিশ্বাসীর সে সান্ত্বনা-বাণী জয়যুক্ত করিয়াছেন।

মাতার অশ্রু দর্শনে, রতিকান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল. চিন্তামণি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—বাবা রতি, তুই চারটে পাশ করা ছেলে, তোর কত বিদ্যে, কত বুদ্ধি। তোর দুই দাদা উকিল হয়েছে বোলে, তোকে আর আইন পড়তে দিলুম না, এই জমিদারী দেখবার জন্যে তো একজনকে চাই, উনি পেন্সান নিয়ে ঘরে থাকলে কি হবে, এখন কি আর এ বয়সে, ঘুরে ঘুরে দেখা শুনো কোরে বেড়াতে পারেন? তুই-ই ঘরে থাকবি, এ সব দেখা শোনা করবি। তা কার কুপরামর্শে এমন ফ্যাঁসাদ ঘটিয়ে বস্‌লি। তুই আমার সুবোধ ছেলে, এমন অন্যায় কাজ তোকে কি সাজে বাবা!

কমলা তোর জন্যে বড় কাতর হয়েছে, তাকে আনতেও পারি না, এলে তার ঘর চলে না. হরদাদাকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে একবার যাবি, তোকে দেখলে তবে তার বুক ঠাণ্ডা হবে। অনেক দূরের পথ, কাউকে পাঠাতেও পারি না। ছোট ছেলেটি নিয়ে অল্পবয়সে বিধবা হোলো, বাছার আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, ছোট ভাইটি অন্ত প্রাণ। তোকে কাছে পেলে দু'দিন থাকবে ভাল। আর মহেশ বাবুদেরও চিঠি পাঠিয়েছি, আমি তোরে শীগ্‌গীর সংসারী কোরতে চাই।

রতিকান্ত নিঃশব্দে মাতার এতগুলি কথা শুনিয়া লইল। যতখানি দোষ সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে দুই বৎসর কাল কারাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, ততখানি দোষ তাহার না থাকিলেও সে নিজেই নিজের ভ্রম, ত্রুটির জন্য যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতেছিল. এখন কেমন করিয়া, কোনও একটি বড় কাজের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করিয়া, এ অপরাধের দায় হইতে মুক্তি পাইবে. আজকাল সে কেবল ইহাই ভাবিতেছে. তাই মাতার কথাগুলি তাহার প্রাণে বড় বাজিল। মাতার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, আমাকে তুমি মাপ কর না. তোমার আর কোনও ভয় নাই, এবার তুমি আমায় বিশ্বাস কর. তোমার মনে ব্যথা লাগবে এমন কাজ আর আমি কোরবো না।

মাতা সস্নেহে পুত্রের ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন, সে কি বাপ, আমি কি তোর ওপর রাগ করেছি যে মাপ কোরবো? ছেলে যত ভুলচুক করুক, মার কাছে তার কোনো লজ্জা নেই, ভগবান্ তোর মঙ্গল করুন।

খাঁতি রাখিয়া স্নেহময়ী জননী পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, সোনার দেহ কালো হয়ে গেছে। সবাই শীগ্‌গীর কোরে বিয়ে দিতে বলছে, আমি কিন্তু মহেশ বাবুর প্রত্যাশায় বসে থাকতে পারবো না. দেশে ললিতার মতো মেয়ে কত পাওয়া যাবে, বৈশাখ মাসে আমি শুভ কাজটি সুভালা ভালিতে সারতে চাই-ই, তা তোকে শুনিয়ে রাখলুম।

রতিকান্ত উত্তর দিল না, দাসীর আহ্বানে চিন্তামণি উঠিয়া গেলেন, রতিকান্ত বুঝি ধ্যানে বসিল। তাহার মানসে ললিতার ছবি জাগিয়া উঠিল. দুইবৎসর পূর্ব্বেকার আনন্দ-রঞ্জিত দিনগুলি যেন চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, হাস্য-পরিহাস নিপুণ বাক-চতুরা ললিতার সরল মাধুরী, চা—এর টেবিলে বসিয়া, সন্ধ্যা কালে, গল্প-গুজব, ললিতার লাজ-নম্র

ব্যবহার, মহেশ বাবুর সহিত যুক্তিপূর্ণ তর্ক, সবই একে একে রতিকান্তের মনে পড়িতে লাগিল।

কারাগৃহে আত্মীয় স্বজন বিচ্ছেদ-বেদনার স্মৃতি-মধ্যে, ললিতার স্মৃতিও তাহার মনে তেমনি পরিস্ফুট ও সমুজ্জ্বল ছিল। আর ললিতা,—সেও কি এমনি সমভাবে, তাহার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধরিয়া আছে? যদিও তাহার নিকট হইতে কখনও ভাষায় প্রণয়বাণী সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু দৃষ্টির মধ্যদিয়া, সরল অন্তরের যে ভাষা পড়িতে পারা যায়, তাহাই কি নব প্রণয়ীর পক্ষে যথেষ্ট নয়? দুই বৎসরের দীর্ঘ দিন গুলির অন্তরালে, সে ছবি কি কিছু ম্লান হয় নাই? এতখানি আশার কথা তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু অবিশ্বাস করিতেই বা প্রবৃত্তি হয় কই? রতিকান্তের প্রণয়-বিহ্বল-মুগ্ধ-মানস, বক্ষের নিভৃত কন্দরে বসিয়া গাহিতে লাগিল "ললিতা, চিরমনোরমা প্রিয়তমে, এই লাঞ্ছিত বিড়ম্বিতকে কি তুমি তেমনি সাদরে গ্রহণ করিতে পারিবে?"

তৃতীয়

ছেলেদের হৈ-হৈ শব্দ কাণে আসিবামাত্র, হরদাদা ঘরের জানালাটা ভেজাইয়া দিলেন। কিন্তু 'যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যে হয়' এ পুরাতন প্রবাদবাক্য মিথ্যা হইবার নয়। ছেলের দল হরদাদার দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু গোটা কতক না ঢুকিতেই ছোট্ট ঘরটি ভরিয়া গেল। হরদাদা তামাক সাজিতেছিলেন, সশব্যস্তে কহিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর জুতর ধূল গুলো ঘরে ভিতর দিয়ো না, চল ঐ আমগাছ তলায় বোসবে চল, আমি আসছি। ছেলের দল যখন তখন আসিয়া হরদাদাকে লইয়া গল্প গুজব করিতে বসিত। আজ বোধহয় দাদার গল্প বলিবার মতো মেজাজ ছিলনা, সেই জন্যই দূর হইতে এই ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে দেখিয়াই, উহাদের দৃষ্টিকে এড়াইবার জন্য জানালা ভেজাইয়া দিয়া পার পাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ফন্দী ব্যর্থ হইয়া গেল। কোনোপ্রকার অছিলা আর এখন নিরর্থক জানিয়া, তিনিও ভাল মানুষটির মতো হুঁকা হাতে দলবল লইয়া আমগাছটির তলায় আসিয়া বসিলেন। অমূল্য বলিল, আজ কিন্তু খুব জিতেছি, ওদের দল আজ মোটেই খেলতে পারে নি।

ব্রজলাল কহিল, ওদের স্কুলের দল, দুই বার থেকে আর আমাদের সঙ্গে ম্যাচ্ দিতে পারে না, ওদের পাণ্ডা ছিল শিবনাথ, সে মরে গিয়ে পর্য্যন্ত ওরা কাপ্তেনশূন্য হয়ে পড়েছে।

অক্ষয় কহিল, শচী বলছিল, রতিদাকে না কি ওরা কাপ্তেন কোরবে।

অমূল্য কহিল, তা হোলে কিন্তু সামাল সামাল ডুবলো তরী, রতিদা পাকা খেলোয়াড়, উনি যদি কাপ্তেন হন, আমাদের দল নীচু হয়ে যাবে।

হরদাদা কহিলেন, তা এ পাড়ার দল রতিকে ও পাড়ার দলে যেতেই বা দেবে কেন? তোমরাই কেন রতিকে আগে থাকতে কাপ্তেন কোরে নেও না। অমূল্য ও অক্ষয়ের চোখে চোখে টেলিগ্রাম হইয়া গেল, পুলিশ-চিহ্নিত, রতিকান্ত এখন যে ছেলেদের দলপতি হইবার অনুপযুক্ত, প্রত্যেক অভিভাবকই ছেলেদের তাহা বুঝাইতে সুর করিয়াছেন, ছেলেদের দলে তা লইয়া বেশ একটি আন্দোলন চলিয়াছে। রতিকান্তকে সকলেই যথেষ্ট ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত, তাহার নেতৃত্বে সকলেই গৌরব অনুভব করিত, কিন্তু গুরুজনের অবাধ্য হওয়া উচিৎ নয় এবং হরদাদা রতিকান্তকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, সেজন্য তাঁহাকে এ কথার আভাস জানাইয়া বেদনা দিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না।

ব্রজলাল বলিয়া উঠিল, একটা গল্প বলুন দাদা, খেলে টেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, শুনে ঘরে যাই। অক্ষয় কহিল, সেই ভাল, কিন্তু আজ একটা নূতন গল্প চাই দাদা, হর্তুকীর মহিমা আর প্রচার কোরবেন না।

হরদাদা মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হরিতকীর নিন্দে ভুলেও করো না ভায়া, বয়েস পাকুক, ওর কদর বুঝবে তখন। দীনেশ কহিল, হরদা, আমি একটা পৈট্রী লিখেছি, সেটার নাম দিয়েছি 'হরিতকী স্তোত্র'—সত্যি!

সত্য কহিল, হেডিংটাই যা লিখেছ, পৈট্রীর তো মোটে এক কলি লিখে আর মেলাবার যোগ্যতা হয় নি, ভারি আমার পৈট্রী এই শুনুন হর দা,—

জয় জয় জয়,　　হর্তুকীর জয়,
গাও কোটী কণ্ঠ মিলে—

দীনেশ অপ্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু হারিলে লোকের লজ্জাটা রাগের আকারেই প্রকাশ হয়, সংসারের নিয়মই এই। তাই সে কহিল, ঐ এক কলিই লেখ, দেখি একবার যোগ্যতা। পৈট্রী অমনি লিখলেই হলো না, ঐ দু'লাইন লিখতে কাল রাত্রে আমার হিষ্ট্রী জিয়োগ্রাফীর পড়া হয় নি।

হরদাদা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, হবে হবে, অমনি কোরেই হবে, এক এক কলি কোরেই লিখতে লিখতে গোটা টা হোয়ে যাবে, ব্যস্ত কিসের।

অক্ষয় আবার তাড়া দিল—গল্প বলুন হর দা।

হর দাদা হুকাটি মুছিয়া,সাবধানে এক পাশে রাখিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হইয়া, তাঁহার কত খানি বৈরাগ্য হইয়াছিল, যাহার প্রবল ধাক্কায় তিনি আঠার বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী সাজিয়া গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাটীতে বাপ মা ছিলেন না, ছিলেন এক দূর সম্পর্কীয়া মাসীমা,তাঁহার উপর স্নেহের আধিপত্য বড় একটা ছিল না,যেটুকু ছিল বুঝি সেটা লৌকিক ও মৌখিক। কাজেই পথে পথে ঘুরিয়া, কতদিন অনশন-ক্লেশ সহ্য করিয়াও ঘরের টানে আর তাঁহাকে ফিরাইতে পারে নাই। গেরুয়ার চাপরাশ একবার পরিতে পারিলে আর যেখানকার দুয়ার বন্ধ হউক,দেব-মন্দিরের প্রাঙ্গণ তো বন্ধ হইতে পারে না। হরদাদা অনায়াসেই তীর্থে তীর্থে ঠাকুর-মন্দিরে দু' চার দিন করিয়া বাস করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ যেন বড় ফাঁকা, বড় উদাস বোধ হইত, হঠাৎ এক দিনের একটি ঘটনা তাঁহার জীবনে এক নূতন অঙ্কের সূচনা করিল। এক ধনাঢ্য জমীদার দেবদর্শনে আসিয়াছিলেন, মন্দিরে সস্ত্রীক পূজারতিতে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। দুইবৎসরের একমাত্র আদরিনী কন্যা মুনি যে এই অপরিচিত দেশে, ভিড়ের মধ্যে, বার বৎসরের বালক ভৃত্য হারুয়ার কোলে, মূল্যবান গহনাদি পরিয়া এতক্ষণ রহিয়াছে সে কথা কাহারও মনে নাই। দরোয়ানকে কাপড় আনিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। একজন দুষ্ট লোক সহজেই নিঃসঙ্গ বালক ভৃত্যটির নিকট হইতে মুনিকে চাহিয়া লইয়া বাহিরের দিকে গেল। এদিকে সাধু সঙ্গ-গুণে হরদাদার গাঁজায় দম দেওয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তিনি অদূরে বসিয়া গাঁজা টিপিতেছিলেন, দুষ্ট লোকটির চেহারা তাঁহার চখে ভাল লাগে নাই, ফুটন্ত ফুলের মত সুন্দর মেয়েটিকেই বা সে কোলে লইয়া বাহিরের দিকে গেল কেন? তিনি গাঁজা ফেলিয়া বালক ভৃত্যটির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও কোথায় গেল? খুকীকে নিয়ে গেল কেন? ভৃত্য কহিল, বাবু খুকীকে চেয়েছেন, খুকীর নামে পুজো হবে, তাইতে নিয়ে গেল। হরদাদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া লোকটার সন্ধানে গেলেন।

চতুর্থ

হরদাদাকে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, কেহ কেহ হাসিয়া উঠিল। অক্ষয় চঞ্চল ভাবে কহিল, তারপর দাদা? হরদাদা বুঝি এতক্ষণ মানস-চক্ষে সেই বিগত ঘটনার স্মৃতি-ছবি দেখিতেছিলেন, মুনির

হাসি মাখা, কুসুম-সুকুমার মুখখানি নিমিষে কেমন করিয়া তাঁহার বক্ষের সমস্ত শূন্যতা ভরিয়া দিয়াছিল, তার কণ্ঠস্বর, মধুর আহ্বানে কেমন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সুপ্ত-বাৎসল্য ভাবকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, কি করুণমর্ম্মস্পর্শী, অথচ আনন্দপূর্ণ সেই স্মৃতি !

ভালবাসিয়া, স্নেহ করিয়া, সেই স্নেহের ধনকে কালের নির্ম্মম করে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়া যে দাগা পায়, সে এক রকম ভাগ্যহীন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কখনও ভালবাসার স্বাদ পায় নাই—যে কখনও প্রাণ ঢালিয়া স্নেহ মমতা করিবার অবসর পায় নাই, তার চাইতে হতভাগা জগতে বুঝি আর নাই। মনুষ্য জীবনে বিশ্ব-দেবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানেই যে সে বঞ্চিত রহিয়া গেল। হরদাদার মনে পড়িল, ভগবানকে ধন্যবাদ যে, জীবনে সে বঞ্চনার হাত হইতে তিনি এড়াইতে পারিয়াছেন। ছোট বেলায় পিতৃ মাতৃহীন হইয়া, আত্মীয় বন্ধুহীন গৃহে, নির্ম্মল স্নেহের সম্ভোগে তিনি বঞ্চিত হইয়া সংসারে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, ভাই বোনের সরল পবিত্র ভালবাসা, স্নেহের মাধুর্য্য রসের ছোপ তাঁহার অন্তঃকরণে ধরাইতে পারে নাই। একটু বয়স হইলে, লেখা পড়ায় তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন তাঁহার মনে মনে উদ্দেশ্য ছিল, লেখা পড়া শিখিয়া তিনি একজন বড়লোক হইবেন। কিন্তু প্রথম উদ্যমেই তাঁহার সমুদ চেষ্টা—আশা ভঙ্গে তিনি যেন একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া গেলেন। সংসারে তাঁহার স্নেহের বন্ধন ছিল না, তবু তিনি গ্রাম ছাড়িয়া ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে তখনও সহরে যান নাই, কিন্তু তারপর সংসারের নিকট ছুটী লইয়া একেবারে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু প্রাণের মধ্যে দিনের পর দিন যেন একটা কিসের শূন্যতা বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার মনে হইল, এ শূন্যতা বুঝি চিরদিনই তাঁহার বক্ষ জুড়িয়া আছে, শুধু এতদিন তাঁহার বুঝি চিনিবার শক্তি হয় নাই, কিন্তু এ শূন্যতা কিসের জন্য তাহার সন্ধানই বা মিলিবে কোথায় ?

তারপর যখন সেই দুষ্ট লোকটার অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, সে ছোট্ট মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—খেলেনা লইবে, কি খাবার খাইবে ? তাঁহাকে দেখিয়া যেন লোকটা থতমত খাইয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কার খুকী ? লোকটার মুখে অপরাধীর ছাপ যেন স্পষ্ট আঁকা ছিল। বালিকাকে হাত বাড়াইয়া লইতে যাইবামাত্র, সে যেন পরিপূর্ণ নির্ভরতার সহিতই তাঁহার কোলে ঝাপাইয়া আসিল, আধ আধ কণ্ঠে কহিল, আমি বাবা যাব,

ফুল নেবো—খাবা খাব, ইতি পূর্ব্বে যদিও সেই দুষ্ট লোকটা মুনিকে ফুল ও খাবারের প্রলোভন দেখাইতেছিল, মুনি কিন্তু তাহা পছন্দ করে নাই। হরদাদা বালিকাকে বুকে চাপিয়া চুমা খাইলেন—কি অপূর্ব্ব আনন্দরসে তাঁহার অন্তরাত্মা অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, নিমেষে আজ তাঁহার হৃদয়ের সেই নিবিড় কালো মেঘ ভেদ করিয়া মুনির সমুজ্জ্বল গোলাপী মুখখানি সেইখানে ঝল ঝল করিতেছে।

মুনির পিতা মাতা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার হরদাদাকে ধন্যবাদ জানাইলেন। তাঁহার পরিচয় লইয়া সহজেই এই আত্মীয়-বান্ধব-হীন যুবাটির প্রতি স্নেহশীল হইয়া পড়িলেন। মুনি তিন চার দিনেই হরদাদার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। হরদাদা জীবনে যাহার স্বাদ পান নাই, আজ হঠাৎ সেই স্নেহামৃত পানে যেন বিভোর হইলেন, সুতরাং যখন মুনির পিতা মাতা তাঁহাকে তাঁহাদের সঙ্গে লইতে চাহিলেন, মুনির মায়ায় পড়িয়া সহজেই তিনি সম্মত হইলেন। সাধের গেরুয়া ছাড়িয়া গাঁজার কলিকা বিসর্জ্জন দিয়া ভদ্র ছেলের মতো মুনিদের দেশে গেলেন। মুনি তাঁহাকে মায়ার শত বন্ধনে বাঁধিয়া, অবশেষে সেই সমস্ত বন্ধন নিমেষে ছিন্ন করিয়া ছয় বৎসরের মুনি কোথায় পলাইয়া গেল। তাহার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তিরোভাবও তার চাইতে কিছু কম বিস্ময়কর নহে। হরদাদার বুকে বড় বাজিল, সন্তানহীন শোকাতুর জনক-জননীর সংবাদ না রাখিয়া, তাঁহাদের নিকট একবার বিদায়-বাণী উচ্চারণ না করিয়া, তিনি আর একবার সংসারের বাহির হইয়া পড়িলেন। মুনি-শূন্য ঘরবাড়ীর দৃশ্য যেন তাঁহার চক্ষে তপ্ত শলাকার মতো বিঁধিতেছিল, সে অসহ্য দৃশ্যের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনির্দ্দিষ্ট পথে আর একবার যাত্রী হইয়া বাহির হইলেন। কত দেশ ঘুরিলেন। কালে শোকের জ্বালা লাঘব হইয়া আসিল, কিন্তু মুনির স্মৃতি তাঁহার অন্তর-পটে চির সমুজ্জ্বল হইয়াই রহিল।

কত দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ শ্রীকান্ত বাবুর সহিত আলাপ হইয়া গেল। এক সন্ন্যাসীর নিকট হরিতকীর মহৎগুণ শুনিয়া শুনিয়া ক্রমে হরদাদা হরীতকীর একজন পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীকান্ত বাবুর একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি তাঁহার সহিত তাঁহার দেশে আসিলেন। বার বছরের রতিকান্তকে দেখিয়া, সহজেই তাঁহার চিত্ত আবার একবার গলিয়া গেল, কতদিন পরে আবার তিনি সেই স্নেহাস্বাদ ফিরিয়া গ্রহণ করিলেন।

হরদাদার সরল,সুন্দর স্বভাব সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করিল। অবশেষে তাঁহার সহিত গ্রাম শুদ্ধ লোকের দাদা সম্পর্ক হইয়া গেল। যদিও তাঁহার বয়স তখন ৩৫ | ৩৬এর বেশী হয় নাই, কিন্তু ছেলে হইতে বুড়া পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। তিনিও এই পরিবারের ও সকলের পরমাত্মীয় হইয়া দিনের পর দিন, গল্প করিয়া, আর সর্ব্বরোগ-হরা হরীতকীর মহিমা প্রচার করিয়া নিরুদ্বেগে কাল কাটাইতে ছিলেন।

হরদাদার অতীত জীবনের এই করুণ ইতিহাস, ছেলেরদলের সরল চিত্তকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। গল্প শেষ হইয়া গেল, কাহারও মুখে কথা নাই, হঠাৎ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যতীন বলিয়া উঠিল, এ তো গল্প নয় হরদা, এ যে সত্যিকার কথা!

বালকের মনে গল্পের মানুষদের দুঃখ বেদনার কথা সত্যকার মতই আঘাত দেয়, কিন্তু সে গুলি সত্য নয়—কাল্পনিক মিথ্যা, এই ভাবিয়াই সকলে সে বেদনার কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলে, কিন্তু আজ হরদাদার নিকট গল্পচ্ছলে যে কাহিনী শুনিল, তাহার ব্যথা তো সহজে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার নয়, যতীনের মনে সব চাইতে বুঝি তখন ঐ কথাটাই উঠিতেছিল। (ক্রমশ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

কুশদহের ইতিহাস

বণিক, বঙ্গদেশে বণিকের শ্রেণী পাঁচটি। ব্যবসাভেদে শ্রেণী ভেদ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথম শ্রেণী মণিবেনে অর্থাৎ যাঁহারা হীরা মুক্তা প্রবালাদি বিক্রয় করেন। দ্বিতীয় শ্রেণী গন্ধবণিক। এই শ্রেণীর লোকের ব্যবসা অনেক প্রকারের। প্রথমতঃ, গন্ধদ্রব্য—চন্দন, কর্পূর, কস্তুরী, কুস্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, জটামাংসী প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ,—এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনী, ধনিয়া,মহুরী প্রভৃতি মসলা। তৃতীয়তঃ-ঔষধ প্রস্তুতের উপকরণ—যথা, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, কুমটী, কণ্টিকারী, শুট,—ওলটকম্বল, রক্তকম্বল ইত্যাদি। চতুর্থতঃ, লবণ। গন্ধবণিকেরা

কেবল যে উপরি লিখিত দ্রব্যগুলির ব্যবসায় করিয়া ক্ষান্ত থাকেন তাহা নহে, গৃহস্থের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাঁহারা বিক্রয় করেন। সোনার বেনেরা স্বর্ণব্যবসায়ী অর্থাৎ পোদ্দারী করেন। টাকা ধার দিয়া সুদ গ্রহণ তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। পঞ্চম বণিকেরা কেবল শঙ্খ প্রস্তুত ও বিক্রয় করেন। কাংস বণিকেরা কাঁসার দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া থাকেন। বেনের ছেলেরা প্রায়ই চাকরী স্বীকার করিতে নারাজ। জাতি ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সকলেই প্রায় উদ্যোগী। বণিকগণের মধ্যে এইরূপ আত্ম-নির্ভর ক্ষমতা আছে বলিয়াই আজও দেশীয় লোকের হস্তে যাহা কিছু ব্যবসাবাণিজ্য রহিয়াছে। বণিক পুত্রেরা তাঁতি প্রভৃতি শিল্পীগণের ন্যায় চাকরীর মোহে পড়িলে আজ কি দুর্গতি ভোগ করিত তাহা বলা যায় না।

ভৃগুরাম-সংহিতা বা পরশুরাম-সংহিতায় বণিকের এই পাঁচটী শ্রেণী দেখা যায়। তাহা হইতে বুঝা যায়, একই বণিক ব্যবসায় ভেদে পাঁচ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মত অন্যরূপ, উক্ত গ্রন্থে দেখা যায় অম্বষ্ঠ ও গন্ধবণিকের পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা বৈশ্যা। কাংসকার ও শঙ্খকার গন্ধবণিকের ন্যায় উৎপন্ন। কিন্তু সুবর্ণবণিকের পিতা অম্বষ্ঠ ও মাতা বৈশ্যা। পরশুরাম সংহিতার মতে গন্ধবণিকেরও পিতা অম্বষ্ঠ ও মাতা রাজপুতকন্যা। যাহা হউক, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে বণিক জাতিগুলি সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত। বণিকেরাই যে প্রাচীন কালের বৈশ্যজাতির বংশধর তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বল্লালচরিত পুস্তকে উল্লিখিত আছে, গৌড়ে অর্থাৎ বঙ্গদেশে বণিকেরা সঙ্গদোষে রাজ কোপে ও আচার বর্জ্জিত হওয়ায় পতিত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে বণিকজাতি কতকাল হইতে গৌড়দেশে (বাংলায়) বাস করিতেছেন, কোথা হইতে বা তাঁহাদের আগমন হইল এবং কিরূপেই বা তাঁহারা সঙ্গদোষে পতিত হইলেন।

বণিকজাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা বৎস রাজের রাজধানী কৌশম্বী নগরে সুখে বাস করিয়া ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। পরে কোন কারণে একদল গুর্জ্জর দেশ হইয়া উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে ও পরে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা কৌশম্বী বণিক নামে পরিচিত আর একদল গঙ্গাপ্রবাহের অনুসরণ করিয়া বিশার্ণ পর্ব্বতের সানুদেশ

লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থিত প্রাগ্‌ জ্যোতিষপুরে (আসামে) বাস করেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বণিক নামে অভিহিত হন।

যাহা হউক, গন্ধবণিকেরা যে কৌশম্বী হইতে বাংলা উড়িষ্যা ও আসামে আসিয়া বাস করেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। কৌশম্বীতে তাঁহারা নিরুপদ্রবে বাস করিতেছিলেন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ, কোন বিশেষ উপদ্রব বা বিপ্লব উপস্থিত না হইলে স্বদেশ ছাড়িয়া দলে দলে বিদেশ যাত্রা করেন নাই। যখন কৌশম্বীপতি বৎসরাজের নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহারই সময়ে বা তাঁহার রাজ্যাবসানে যে এই উপনিবেশ স্থাপন ঘটিয়াছিল তাহা মনে করা যাইতে পারে।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গৌড় ও বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মরুভূমিতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সম্ভবতঃ, বৎসরাজের পলায়নের সময় রাজধানীর সমৃদ্ধ নগরবাসিগণ তাঁহার সহিত পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু মরুভূমিতে অধিক দিন অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া বণিকগণ প্রথমে গুজরাটে, পরে মধ্যদেশে এবং শেষে উড়িষ্যায় ও বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেননা, এসময় গৌড় ও উড়িষ্যা পাল রাজগণের শাসনাধীনে শান্তি ভোগ করিতেছিল। উত্তরাপথে খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগে ও নবমশতাব্দীর প্রথমভাগে পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব ঘটায়, বণিককুল আকুল হইয়া পড়েন এবং শেষে কেশরী ও পালরাজগণের আশ্রয়ে বাস করিয়া নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। দেশে তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোত চলিতেছিল সুতরাং সে সংশ্রবে বণিকগণের ভিন্ন আচার হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রবাদ আছে, বণিকগণ যখন বঙ্গদেশে প্রথম আসিয়াছিলেন তখন তাঁহারা ঘোর শৈব ছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, চাঁদ সদাগর শিবের উপাসক ছিলেন। শিব ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই—থাকিতে পারে না, শিব সকলের ঈশ্বর এই অটল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনসা পূজা করিতে অসম্মত হন। মনসাও নাছোড় বান্দা; চাঁদ সদাগরের নিকট পূজা না পাইলে জগতে তাঁহার পূজা প্রচারিত হয় না এই জন্য তিনি অশেষ

প্রকারে চাঁদকে নিগৃহীত করিতেছেন। একে একে চাঁদের বাণিজ্য পোতগুলি জলমগ্ন করিলেন। এক একটি করিয়া চাঁদের ছয়টি পুত্রকে যমসদনে পাঠাইলেন। চাঁদ তথাপি অটল! চাঁদ জানেন, তাঁহার ইষ্টদেবও যেরূপ শোক-মোহ, সুখ দুঃখ, কামক্রোধাদির অতীত, তাঁহার ভক্তগণ সেইরূপ হইতে চেষ্টা না করিলে, তাঁহাকে পাইতে পারেন না, —কাজেই পুত্রনাশ, অর্থনাশ, মনস্তাপ ও পরিজনের গভীর শোকে চাঁদ চিত্ত-দৌর্ব্বল্য দেখাইলেন না—তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিল না। পরিশেষে ভগবান্ দেবাদিদেব যখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা, তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইলেন, তখন ভক্তের ভগবান ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নাই—যত্র জীব তত্র শিব। বৃক্ষলতা গুল্ম হইতে সামান্য কীট পতঙ্গ সমস্তই তিনি (?) সুতরাং মনসা ও তাঁহাতে ভেদ নাই। নাম ভেদ মাত্র। ভগবৎ কৃপায় চাঁদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল। চাঁদ শিবময়জগৎ দেখিলেন, তখন আর মনসাতে তাঁহার অশ্রদ্ধা রহিল না, নিজ ইষ্টদেবের নাম ও রূপান্তর মনে করিয়া তিনি তাঁহার পূজা করিলেন। ভগবানও সদয় হইয়া তাঁহার যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছিল সমস্তই প্রত্যর্পণ করিলেন। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ধনপতি সদাগরকেও এইরূপ শিবোপাসক দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রিয়তমা পত্নী খুল্লনার অনুরোধে চণ্ডী মানিতে অসম্মত—পূজা করা দূরে থাকুক, চণ্ডীর ঘট দূরে ফেলিয়া দিয়া ধনপতি বাণিজ্যার্থ সিংহলে যাত্রা করিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা চণ্ডীকাব্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (বি এ)

কে বড় ?

আত্মার শক্তি না দেহের শক্তি ?

অধ্যাপক মরে হিবার্ট "জর্ণাল" নামক প্রসিদ্ধ পত্রে আত্মার শক্তি কেমন তাহা বুঝাইবার জন্য মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধির শক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি নামক এক যুবক

আইন পাঠের জন্য ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তিনি ধনী ও কার্য্যকুশল জ্ঞানোজ্জ্বল পরিবারসম্ভূত, ভদ্র ও বিনয়ী। সাধারণে যেমন পোষাক পরিয়া চলা-ফিরা করে, তিনিও তেমনই করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার কোন বিশেষত্ব ছিল না। মদ্য স্পর্শ করিব না ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইব না, তখনই তিনি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের সঙ্কল্প কেহ জানিত না। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই নগরে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে ব্যবসায়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্মই তাঁহার অনুরাগের বিষয় ছিল। ক্রমে তাঁহার বাসনাশৃঙ্খল ছিন্ন হইল ; সামান্য অর্থ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাখিয়া আর সমস্ত বিত্ত-সম্পত্তি সৎকার্য্যে দান করিলেন। জোর জুলুমের সাহায্যেও লোকে স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত করে, সুতরাং আদালতে কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মহানি হইবে বলিয়া তিনি শেষে ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিলেন।

বহুদিন পরে ১৯১৪ সালে পুনরায় ইংলণ্ডে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কেবল ভাত ও জল খাইতেন ও ভূমিতলে শয়ন করিতেন। তাঁহার স্ত্রী যথার্থই তাঁহার সহধর্ম্মিণী—তিনি সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর অনুসরণ করিতেন। মিঃ গান্ধির কথাবার্ত্তায় শিষ্টতা ও বহুশ্রুতের পরিচয় পাওয়া যাইত। সাধুর লক্ষণ তাঁহাতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার জন্মভূমিকে ভালবাসেন সুতরাং ভারতীয় ভাবে ভারতের নবজীবন সঞ্চার করাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তিনি মানুষে মানুষে পার্থক্য রাখিতে চান না, জগতের ধনীর নিকট শ্রমজীবীর দাসত্ব, ধনৈশ্বর্য্যমূলক সভ্যতা, অর্থের পূজা ও জাতিতে জাতিতে সংগ্রামের তিনি বিরোধী। প্রাচ্যদেশের অধিবাসীগণ সাধুদিগকে বড় ভক্তি করেন। কেহ সাধু কি অসাধু, জনসাধারণ স্বার্থত্যাগের দ্বারাই তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকে। দরিদ্র ব্রত অবলম্বন কর, অন্ন ও জল খাইয়া সহজ ভাবে প্রাণ ধারণ কর, জনসাধারণ তোমার উপদেশ ভক্তির সহিত শ্রবণ করিবে। ভাল খাও, ভাল পর, তোমার কথায় কেহই কর্ণপাত করিবে না।

জনসাধারণের মনের উপর গান্ধির অসাধারণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে তিনি জয়যুক্ত হইয়াছিলেন তাহার কারণ এই,—

তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,কাহারও কোন অনিষ্ট করিবেন না, কাহারও উপর অত্যাচার করিবেন না, কিন্তু তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহাকে যে দণ্ড দিবেন তাহা সহ্য করিবেন। দণ্ডদান করিতে করিতে এমন দিন আসিবে যখন বিপক্ষেরা শ্রান্ত এবং আপনাদের কৃতকার্য্যের জন্য লজ্জিত হইবে। তিনি যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার মূল মানবাত্মার সহিত দৈহিক ও আর্থিকশক্তির বিবাদ। তাহার ফল চিরদিন যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। দৈহিক ও আর্থিক শক্তি আপনার পতাকা ফেলিয়া দিয়া অবশেষে আত্মার চরণে অবনত হইয়াছে।

যাহারা ইন্দ্রিয়ের আনন্দকে তুচ্ছ করে—যাহারা ধনকে গ্রাহ্য করে না, পার্থিব সুখ, প্রশংসা বা মর্য্যাদা যাহার নিকট কিছুই নয়, যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া জানে তাহাই পালন করিতে বদ্ধপরিকর, এমন লোকের সহিত বিরোধ করিতে সম্রাট্ যিনি তাঁহারও সতর্ক হইতে হয়। কারণ তুমি তাঁহার শরীরকে জয় করিতে পার কিন্তু এমন কিছুই নাই যদ্দারা তুমি তাঁহার আত্মাকে ক্রয় করিতে পার।"

অধ্যাপক মরে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। গান্ধি দেহ নহেন তিনি আত্মা। সুতরাং তিনি নির্ভয়, মোহ-প্রলোভনের অতীত। চিন্ময় যে তাহাকে বান্ধিবে কে? (সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত)

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

বঙ্গীয় হিতসাধন সমিতির বিগত প্রদর্শনী হইতে নিম্নলিখিত তথ্য-গুলি সংগৃহীত হইল:—

শিক্ষার অবস্থা

বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশের অবস্থা কি? এই দেশের ৭ জন পুরুষের মধ্যে ৬ জনে এবং ৯৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন অক্ষর পড়িতে জানে। এই দেশে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার তালিকা।— ১০০ জনের মধ্যে

হিন্দু	১১·৮	মুসলমান	৪·১
ব্রাহ্ম	৭৮·২	খৃষ্টান	৪৬·৪ জনের

অক্ষর পরিচয় হইয়াছে। বঙ্গদেশে কয়েকটি জাতির মধ্যে লেখাপড়া কতদুর প্রসার লাভ করিয়াছে।

শতকরা

বৈদ্য	৭১.৯	কায়স্থ	৫৬.৮
ব্রাহ্মণ	৬৪.৩	কৈবর্ত্ত	২০.৭
ব্রাহ্ম	৮৬.৬	নমঃশূদ্র	.০৯

বঙ্গদেশে ১০০ জনের মধ্যে ১ জন ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারে। জাপানে ১০০ জন বালকের মধ্যে ৯৯ জনে এবং ১০০ জন বালিকার মধ্যে ৯৮ জনে পড়িতে জানে, ভারতবর্ষে ১০০ বালকের মধ্যে ২৩ এবং ১০০ বালিকার মধ্যে ৩ জন পড়িতে শিখিয়াছে।—

বঙ্গের জিলা অনুসারে হিসাব

বঙ্গদেশের জিলাগুলিতে শতকরা কতজনে লেখাপড়া শিখিয়াছে।

১।	দারজিলিং	১০	১৬।	বাঁকুড়া	৯
২।	জলপাইগুড়ি	৬	১৭।	মেদিনীপুর	৯
৩।	কোচবিহার	৭।০	১৮।	হুগলি	১১
৪।	দিনাজপুর	৬	১৯।	হাওড়া	৩০
৫।	রংপুর	৪০	২০।	চব্বিশপরগণা	১২
৬।	মালদহ	৫	২১।	যশোহর	৭
৭।	রাজসাহী	৫	২২।	ফরিদপুর	৬
৮।	বগুড়া	৬	২৩।	খুলনা	৮
৯।	ময়মনসিংহ	৫	২৪।	বরিশাল	৯
১০।	ঢাকা	৮	২৫।	নোয়াখালি	৬
১১।	পাবনা	৫	২৬।	ত্রিপুরা	৭
১২।	নদীয়া	৬	২৭।	পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	৪
১৩।	মুর্শিদাবাদ	৬	২৮।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৭
১৪।	বীরভূম	৮	২৯।	চট্টগ্রাম	৭
১৫।	বর্দ্ধমান	১০	৩০।	কলিকাতা	৩২

স্বাস্থ্যবিধির সুফল

কলিকাতা নগরে স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করায় এই নগরে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। হাজারকরা মৃত্যুসংখ্যা।—

১৯০০	৪৫এর কাছাকাছি।	১৯০৫	৩৫ হইতে ৪০ মধ্যে
১৯১০	৩০ হইতে ৩৫ মধ্যে	১৯১৫	২৫ হইতে ৩০ মধ্যে

বঙ্গের অধিবাসীর ধর্ম্ম

হিন্দু	২ কোটী ৪ লক্ষ।	মুসলমান	২ কোটী ৪২ লক্ষ।
বৌদ্ধ	২ কোটী ৫০ লক্ষ।	খ্রীষ্টান	২ লক্ষ ৩৩ হাজার।
জড় পুজক	৭ লক্ষ ৩৩ হাজার।	জৈন	৮ হাজার।
ব্রাহ্ম	৩ হাজার*।	শিখ	২ হাজার।
অপর ধর্ম্মাবলম্বী	১ হাজার।		

যক্ষ্মা।—ব্রিটিশ ভারতে যক্ষারোগে প্রত্যেক বৎসর ৬ লক্ষ লোক মরে, সুতরাং

মাসে	৪৩ সহস্র ২ শত।	দিনে	১৪৪০ জন।
ঘণ্টায়	৬০ জন।	মিনিটে	১ জন লোক

মরিতেছে। কি ভীষণ মৃত্যু! কিন্তু এই মৃত্যুর গতিরোধ করা যাইতে পারে।

এড়াইবার উপায় কি?

১। অমিতাচার বর্জ্জন।

২। অতিরিক্ত পরিশ্রম বর্জ্জন।

৩। রুদ্ধ গৃহে—(দরজা জান্‌লা বন্ধ করিয়া) শয়ন না করা।

৪। যে ঘরে অধিক লোক আছে সেই ঘরে শয়ন না করা।

৫। নাক মুখ ঢাকিয়া শয়ন না করা।

৬। শ্বাসের সঙ্গে ধূম গ্রহণ না করা।

---

* পুর্ব্বে ১০ হাজার দেখা গিয়াছিল, এক্ষণে অন্য কারণে—বিশেষতঃ বহু ব্রাহ্ম এখন হিন্দু বলিয়া লেখাইয়া থাকেন, এজন্য সংখ্যায় কম হইতেছে। (কুঃ সম্পাদক)

৭। দেহে বা আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যে যাহাতে মাছি না পড়ে।

৮। মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ না করা।

৯। মেজের উপর থুথু না ফেলা।

১০। যক্ষা রোগীর সংস্রব হইতে দূরে থাকা।

১১। ধুলিময়, স্যাঁত স্যাঁতে ও অন্ধকার গৃহে বাস না করা।

১২। যাহাতে দেহ দুর্ব্বল হয় এমন কিছু না করা।

১৩। শীতল বিশুদ্ধবায়ু অথবা নৈশবায়ুকে ভয় না করা।

১৪। যে খাদ্য উপাদেয় ও পুষ্টিকর নহে তাহা গ্রহণ না করা।

১৫। খাদ্য দ্রব্য যেন পর্য্যাপ্ত হয়।

জননী যক্ষা রোগে আক্রান্ত, তিনি সস্নেহে তাঁহার পুত্রমুখ চুম্বন করিতেছেন, কিন্তু হায়, ঐ চুম্বন দ্বারা তিনি আপন দেহের ব্যাধি পুত্রদেহে সঞ্চারিত করিলেন।

বালকদের দ্বারা রোগ প্রসার

অনেক বালক স্লেটে থুথু দেয়, হাতের থুথু পুস্তকের পৃষ্ঠায় লাগাইয়া পাতা উল্টাইয়া থাকে, অন্য বালক ঐ থুথু মাখান স্লেট বা পুস্তক হইতে তাহার রোগের বীজাণু গ্রহণ করে।

পানওয়ালী

রুগ্না পানওয়ালীর নিকট হইতে পানের সহিত এই রোগ অনেকে গ্রহণ করে।

বাজারের মিঠাই

বাজারের মিঠাইএর মধ্যে সকল প্রকার অপবিত্রতাই থাকিতে পারে ঐ মিঠাই হইতে এই রোগ ব্যাপ্ত হয়।

এক হুকায় তামাক খাওয়া

একজনে যে হুকায় তামাক খায় স্বজাতিরা সেই হুকায় তামাক খাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। এইরূপে এক জনের থুথু অন্যে গ্রহণ করায় এই রোগ এক জনের দেহ হইতে অন্যের দেহে প্রবেশ করে।

ঐরূপ একজনের মুখের জিনিষ অন্যে খাইলে, কিম্বা এক বাসনে খাইলে এই ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কেমন করিয়া রোগ ছড়াইয়া পড়ে

যক্ষা রোগী থুথু ফেলিল, ঐ থুথুর উপর মাছি বসিল, মাছি উড়িয়া যাহার উপর পড়িবে তাহারই ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার কথা। আবার

মেথর ঐ থুথু ঝাটার দ্বারা ধূলির সহিত মিশাইয়া উড়াইয়া দিল, নিকটে যে শিশু খেলিতেছিল তাহার দেহ ঐ ধূলির দ্বারা ধূসর হইল, ঐরূপে সেও ঐ রোগের বীজাণু গ্রহণ করিল।"

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমরা বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে দেখিতেছি যে, ঈশ্বর-কৃপায় আমাদের "কুশদহ সমিতি" দিন দিন ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট পন্থায় এবং নিয়মিতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। ইহা কুশদহ বাসী-মাত্রেরই অতীব আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

গত ৪ঠা বৈশাখ বুধবার স্কটীসচার্চ কলেজ গৃহে নববর্ষের আনন্দ-সম্মিলন জন্য সমিতির একটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। ইতি-পূর্ব্বে কথা উঠিয়াছিল, "কুশদহ-সমিতি" কি কেবল কুশদহবাসীগণের মেলা-মেসা আলাপ পরিচয় জন্য কিম্বা তদ্দ্বারা দেশের কিছু কায করিতে হইবে। বোধ হয় সকলেই অবগত হইয়াছেন যে সমিতির কার্য্য প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইতিমধ্যে উহার একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা (একজিকিউটীভ কমিটী) গঠিত হইয়াছে। তাহাতে প্রস্তাব হয়, আপাততঃ কুশদহর মধ্যে যে স্থানে একান্ত জলাভাব—সেইরূপ কোন গ্রামের যাহাতে কিয়ৎ পরিমাণেও জলকষ্ট নিবারণ করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা হউক। উক্ত আনন্দ-সম্মিলন দিনে ঐ বিষয় এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। অতীব আহ্লাদের কথা যে, এই আলোচনা ক্ষেত্রে খাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করেন, যদি এই কার্য্যে সমিতি প্রবৃত্ত হন তবে তিনি একাই ৪০০৲ শত টাকা দিবেন। এই উৎসাহ বাক্যে তৎক্ষণাৎ সমিতিমধ্যে এক আশা বিশ্বাসের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া সমিতির মজ্জাগত অবিশ্বাস, নিরাশা বহুপরিমাণে বিদুরিত হইয়া গেল। সকলের মুখে প্রসন্নতার জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল। এতদ্ভিন্ন কুশদহ-সম্পাদকের নিকট আরও ২।১ টি সহৃদয় ব্যক্তি এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যারম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের নাম অপ্রকাশ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ফলতঃ, এই

ঘটনায় "কুশদহ-সমিতির" সভ্যগণ কি মনে করিতেছেন? ইহাতে কি ভগবানের এই ইঙ্গিত প্রকাশ পাইতেছে না, "সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়।" কিন্তু হে, কুশদহ-সমিতির সেবকগণ, আপনারা এই এক কালিন ব্যক্তিগত দান পাইয়া অধীর হইবেন না, আর এক দিকের কথা স্মরণ রাখিবেন। শত শত সভ্যের ঐক্য-বন্ধন এবং চাঁদা আদায় করিতে আপনাদিগকে অপ্রতিহত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা অবলম্বন এবং অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবেই আপনারা বিধাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। একথা যেন ভুলিবেন না।

নববর্ষের অধিবেশন-সংবাদ, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়া পঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

গোবরডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রায়বাহাদুর ভ্রাতৃগণের মাতা ঠাকুরাণী দীর্ঘকাল কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। গত ২৬শে চৈত্র তিনি তথায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রজারঞ্জক সারদাপ্রসন্ন বাবু মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সের মধ্যেই পরলোকগত হন। তখন আমাদের এই পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণীর বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর মাত্র। ইতিমধ্যে ইনি ৯।১০টি সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স প্রায় ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। সারদাপ্রসন্ন বাবু স্বর্গীয় হইলে ইনি অন্নভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এই সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরকাল সেই কঠোর ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের একটি প্রধানতম আদর্শ। মাতা ঠাকুরাণীর আদ্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিগণ সময়োপযোগী যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা প্রস্তাব করি যে, তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি রক্ষার্থ কোন সদনুষ্ঠান করিলে হয় না কি? তিনি যেমন এক প্রকার জল পান করিয়া দীর্ঘকাল কাটাইলেন, তাই কুশদহর কোন স্থানে তাঁহার নামে একটি পানীয় জলাশয় দিলে সকল রকমেই ভাল হয়।

গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামে এবার কলেরায় অনেক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, বেড়গোম, রাণীডাঙ্গা, রাজবল্লভপুর, সাদপুর, বনবনে,

মেটেগাছা প্রভৃতি গ্রামে বসন্তে অনেক গোরু এবং মানুষের মৃত্যু হইতেছে। এজন্য আমরা বারাসাত সাব্‌ডিভিসানাল অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি। "কুশদহ-সমিতি কি ইহার প্রতিকারার্থ কিছু করিতে পারেন না?

আমরা সম্প্রতি দেখিয়া সুখী হইলাম যে, খাঁটুরা বালিকা স্কুলটির ধীরে ধীরে কিছু যেন কাজ হইতেছে। বালিকা সংখ্যা ২০টির উপর আছে,উপস্থিত—১০-১২ হইতে ১৫-১৬টি পর্য্যন্ত হয়। একটি শিক্ষকদ্বারা তৃতীয়মান পর্য্যন্ত পড়ান হয়; সুতরাং যেখানে স্কুল উঠিয়া যাইবারই কথা, সেখানে এতটুকুও দাঁড়াইয়াছে ইহা আহ্লাদের কথা বৈ কি! সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের যত্নের ত্রুটী নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুতেই তিনি স্কুলের অর্থাভাব ঘুচাইতে পারিতেছেন না। আমাদের মনে হয়, গ্রামবাসীগণ একটু মনোযোগ করিলেই এই সামান্য অভাব পূর্ণ হইয়া স্কুলটি ভালই চলিতে পারে।

কুশদহ-সমিতি

(প্রাপ্ত)

গত ৪ঠা বৈশাখ স্কটিশচার্চ্চ কলেজগৃহে, মাটীকোমরা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের নেতৃত্বে কুশদহ-সমিতির "নববর্ষ সম্মিলন" হইয়াছিল। সম্মিলন সভায় বহু সভ্যের সমাগম হয়। এই উপলক্ষে সঙ্গীত, বক্তৃতা, ম্যাজিক ও জলযোগের ব্যবস্থাও ছিল, আর ছিল "নূতন খাতার মহরত"। এই নূতন খাতার মহরত সম্মিলন সভার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ইহা বিধাতার একটি বিধান, ইহা ভগবানের একটি ইঙ্গিত। প্রকৃতি যখন নূতন ভাবে ভাবিনী, বাংলার মাটী, জল, তেজ, আকাশ বায়ু যখন খুব চঞ্চল, গাছ পালা যখন নূতন ফল, ফুল পাতায় শোভিত, এবং প্রকৃতির পূর্ণ কৈশোরাবস্থায় যৌবনের লক্ষণ সকল পরিস্ফুট দেখিয়া, স্বাভাবিক নবজীবনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বাংলার শ্রীমান কর্ম্মী পুরুষগণ (অর্থাৎ দোকানদার, ব্যবসাদার, শিল্পী প্রভৃতিরা) যখন নবোদ্যমে নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত, সেই শুভ বৈশাখের সম্মিলনে সভ্যদিগকে নবজীবন ও নবোদ্যম লইয়া কার্য্য করাইবার জন্য

খাঁটুরানিবাসী সহৃদয় শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয় জলকষ্ট নিবারণ জন্য স্বেচ্ছায় এক কালিন ৪০০৲ টাকা দান করিয়া নূতন খাতার মহরত করিয়াছেন। সুদূর প্রবাস হইতেও কুশদহ বাসী কোনও কোনও ভদ্র মহোদয় মণিঅর্ডার যোগে অযাচিত দান পাঠাইয়া সভ্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এখন সমিতির একটা হিসাব নিকাশের আলোচনা আবশ্যক। দেখা যাউক, জমার ঘরে কি জমিয়াছিল এবং খরচ বাদে মজুদই বা কি আছে। এই বিষয় আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, গত ৩।৪ মাসের ভিতর সমিতির আশাতীত শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে, কিছুই খরচ হয় নাই সবই মজুত, তাহার উপর এই নববর্ষের অর্থ সমাগম। ইহাতে বেশ আশা করা যায়, ১৩২৫ সালে, সমিতি তাহার উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা দেখাইয়া কুশদহবাসীর কতক অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবে। শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুশদহ-পল্লী

বর্ত্তমান বর্ষ হইতে 'কুশদহ-পল্লী রীতিমত বাহির হইবে। কুশদহ-সম্পাদক মহাশয় যখন প্রথমে এই কুশদহ-পল্লী বাহির করিবার প্রস্তাব করেন, তখন আমি উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এক্ষণে উহার উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ইহা লিখিতে বসিয়া জানিতে পারিতেছি যে, সমস্ত বঙ্গদেশ কেন—সুদূর পঞ্জাব পর্য্যন্ত কুশদহের সহিত বিবাহ সূত্রে গ্রথিত।

কুশদহের মধ্যে ইছাপুরের চৌধুরীবংশের বিবরণ এত দিন পাওয়া যায় নাই বলিয়া অন্যান্য বংশের বিবরণ বাহির হইতে পারে নাই। চৌধুরীবংশ এক্ষণে নিষ্প্রভ হইলেও পূর্ব্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। চৌধুরী বংশের পরেই গোবরডাঙ্গার জমিদার মহাশয়দিগের বিবরণ লিখিত হইবে। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ চৌধুরীবংশের আদি পুরুষ হইলেও নব ঠাকুরের সহিত আঠার পাইএর সম্পর্ক একটু তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। চারঘাটের চৌধুরীদিগের সহিত এই আঠার পাইএর ১১ দিনের জ্ঞাতি সম্পর্ক রহিয়াছে।

চৌধুরীবংশের ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রিয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনভাগে

বিভক্ত। শুদ্ধ, সিদ্ধ ও কষ্ট। তন্মধ্যে প্রথম দুই ভাগ হইতে কুলীন ব্রাহ্মণগণ কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা লইলে তাঁহাদের কুল ভঙ্গ হয়। এই চৌধুরীগণ কষ্ট শ্রোত্রিয়। এই জন্য যে সকল কুলীন ইঁহাদের কন্যা বিবাহ করেন,তাঁহাদের "হড় দোষ" হইয়াছে। কুশদহের মধ্যে অধিকাংশ কুলীনই এই দোষে দূষিত। শ্রোত্রিয়গণ কুলীন অপেক্ষা কেন যে নীচ, তাহা জানা যায় না। বেদাধ্যায়ী এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় বলে। শাস্ত্রে শ্রোত্রিয় সম্বন্ধে লিখিত আছে—

১। "ওঁকার পূর্ব্বিকাস্তিস্রঃ সাবিত্রীর্যশ্চ বিন্দতি।
চরিত ব্রহ্মচর্য্যশ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচ্যতে।"

২। "জন্মনা ব্রাহ্মণে জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাত্তবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি।"

৩। একাংশাখাং সকল্পাং বা ষড়ভি রঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্‌কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।"

ইহাদ্বারা শ্রোত্রিয়কে মন্দ ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

আঠার পাই চৌধুরী—ইছাপুরে যে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আছেন, তাঁহার পাদদেশে লিখিত আছে—"রাম জীবন মুলুকাদি শর্ম্মণঃ"।

গঙ্গাধর ভাস্কর নামক জনৈক মারহাটি এই গোবিন্দ দেবের মূর্ত্তী নির্ম্মাণ করিবার সময়ে উক্ত কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে রামজীবন চৌধুরী ও মুলুকচাঁদ চৌধুরী এক সময়ের লোক। কিন্তু মুলুকচাঁদ চৌধুরী রামজীবন চৌধুরীর পৌত্র।

এই চৌধুরীগণ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হওয়ায় শ্রোত্রিয় ও অন্ত্যজ ব্রাহ্মণ দিগের কন্যা ভিন্ন অন্য কন্যা আনিতে পারিতেন না। অন্য কন্যা আনিতে হইলে কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে হইত। কাল মাহাত্ম্যে এক্ষণে বিদ্বান্ শ্রোত্রিয় কুলীন পদবাচ্য এবং মূর্খ কুলীন সমাজে নিন্দনীয় হইতেছে।

আঠার পাই এর রামজীবন চৌধুরীর বিবাহ হেঁড়ে বায়সায় শ্রোত্রিয় ঘরে হয়। রামজীবন চৌধুরীর তিন পুত্র—কৃষ্ণরাম, রামগোপাল ও বিষ্ণুরাম। কৃষ্ণরামের সারসায়, রামগোপালের হেঁড়ে বায়সায় ও বিষ্ণুরামের কুড়ুলগাছিতে বিবাহ হয়।

কৃষ্ণরামের তিনপুত্র মুলুকচাঁদ, গৌরাই ও গোড়াই। রামগোপালের

রামলোচন নামে একটি পুত্র হয়। বিষ্ণুরামের পুত্র নবাই চৌধুরী, তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ ও ঈশ্বর। বৈদ্যনাথের তিন পুত্র—হরিদাস, সুরনাথ ও যোগীন্দ্রনাথ। সুরনাথের পুত্র দ্বিজনাথ এবং যোগীন্দ্রনাথের পুত্র শচী ও ক্ষিতীশ। ঈশ্বরের পুত্র—পরেশনাথ, নবীন ও জ্ঞান।

নবাই চৌধুরীর বিবাহ হেঁড়ে বায়সায়, ইঁহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দম্পতিবরণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে দম্পতিবরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের "দম্পতিবরণ" দোষ হইয়াছে। এইরূপ দোষ ইছাপুরে দুই ঘরে আছে।

বৈদ্যনাথের হেঁড়ে বায়সায় বিবাহ হয়। তিনি বনগ্রামের ৺গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মোক্তারের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। এইজন্য সুরনাথ বাবুরা গঙ্গাচরণ মোক্তারকে "মামা" বলিয়া ডাকিতেন।

ঈশ্বর চৌধুরী সারষায় বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে পরেশনাথের বিবাহ নদীয়ায়, নবীনের হালিসহরে এবং জ্ঞানচন্দ্রের বিবাহ ইছাপুরের পূর্ব্বপাড়ায় হয়। পরেশনাথ চৌধুরীর পুত্র সতীশের বিবাহ কুড়ুলগাছিতে হইয়াছিল। এইখানে আঠার পাই চৌধুরীদের বিবাহ বিবরণ শেষ হইল।

শ্যামাচরণ চৌধুরীর বিবাহ নদিয়ায় হয়। তাঁহার কোন পুত্রাদি না হওয়ায় মাটিকোমরার মুখোপাধ্যায় বংশ হইতে যজ্ঞেশ্বরকে পোষ্যপুত্র লয়েন। এই যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর বিবাহ গৈপুরের বেচারাম ভট্টাচার্য্যের কন্যার সহিত হয়। যজ্ঞেশ্বরের দুই পুত্র শশিভূষণ ও বিধুভূষণ। শশি-ভূষণের প্রথম বিবাহ নদে-গোকনা, দ্বিতীয় বিবাহ পুঁড়ায় হয়। বিধুভূষণের কালীঘাটে বিবাহ হয়।

নব ঠাকুরের বাড়ী—রাজকুমার চৌধুরীর পুত্র বিশ্বেশ্বর চৌধুরীকে রামধন চৌধুরী পোষ্য পুত্র লয়েন। বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ইছাপুরের ধরণী মোক্তারের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র কাশী, কৈলাস, ভূপতি ও ননি। কাশীর প্রথম বিবাহ সেখপুরে, ২য় বিবাহ নদে গোকনায়। কৈলাসের প্রথম বিবাহ হয়দাদপুরে কুঞ্জবিহারী হালদারের ভগ্নীর সহিত ও ২য় বিবাহ ইছাপুরের অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত হয়। ভূপতি, ইছাপুরে জানকীনাথ গাঙ্গুলির কন্যা, ও ননি মাটিকোমরা ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

কুশদহ-পঞ্জী সম্বন্ধে

সম্পাদকীয় মন্তব্য

ভগবানের প্রেরণায় "কুশদহ" সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া এবং তাঁহারই করুণায় কুশদহর কুশল চিন্তায় নিযুক্ত থাকা অবস্থায় স্বভাবতঃ "কুশদহ-পঞ্জী প্রকাশের ইচ্ছা আমার মনে উদয় হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ এই ব্যাপারি সহজ বোধ হয় নাই। কুশদহ-পত্র সম্পাদন-কার্য্যে সহরে থাকিয়া কুশদহর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পঞ্জী-বিবরণ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব, সুতরাং এপর্য্যন্ত তাহাতে নিরস্ত থাকিতেই হইয়াছিল। কুশদহ পঞ্জী প্রকাশের কথা শুনিয়া যাঁহারা সহানুভূতিপ্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন প্রধান সহানুভূতিকারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় তিনিও দরিদ্র! চাকুরী বজায় না রাখিলে তাঁহার চলে না। যাহা হউক, তাঁহার উৎসাহকে ধন্যবাদ! তিনি বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও এই কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিতে সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাই তাঁহার সংগৃহীত বিবরণের কোন ত্রুটী বিচার না করিয়া আপাতত উহাই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, কুশদহ-হিতৈষী এমন কি কেহ আছেন—যিনি পঞ্চানন বাবুকে কিছু দিনের জন্যও চাকুরী হইতে অবকাশ গ্রহণের সুযোগ দিয়া এই মহাকার্য্যে তাঁহাকে ব্যাপৃত করিতে পারেন? তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার অগ্নিময় উৎসাহে অতি অল্প কালের মধ্যেই সমগ্র কুশদহবাসীর বিবরণ সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব হইবে না। কুশদহ পাঠক পাঠিকাগণ দেখিয়া আসিতেছেন যে, তিনি এ পর্য্যন্ত কুশদহর আংশিক কোন কোন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কুশদহে প্রকাশদ্বারা সম্পাদককে কতদূর সাহায্য করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় এক্ষণে কুশদহ-সমিতি হইয়াছে, তন্মধ্য হইতেও যদি সকলে আপন আপন বংশ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন, তবে এই মহাব্যাপারটি সম্পন্ন হইবার পথ অনেক সহজ এবং সুগম হইয়া উঠিতে পারে।

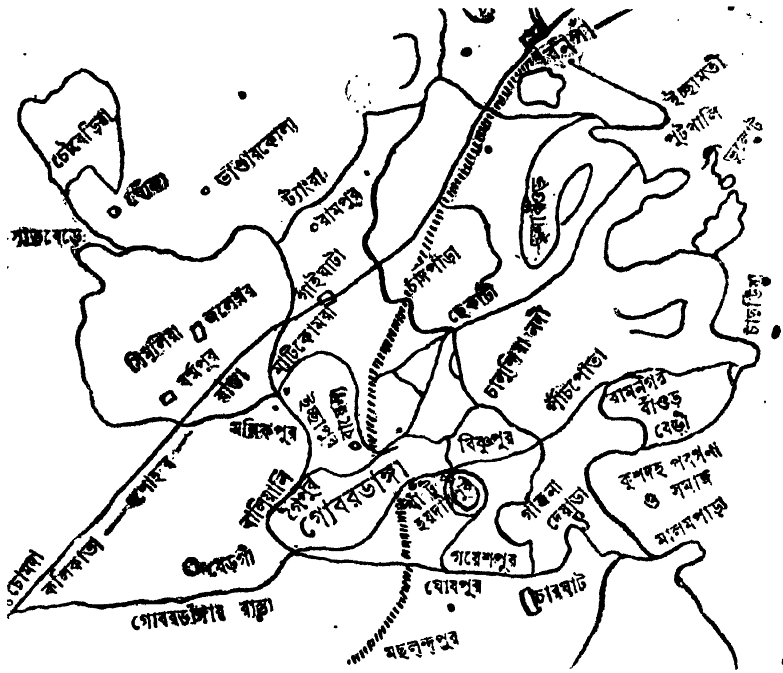
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা, ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিনস্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কার্ত্তিক, ১৩২৫

কুশদহ

স্থানীয় বিষয় সম্বলিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক

মাসিক পত্র



দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত।

কার্য্যালয় :—২৮।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১০
,, সাধারণতঃ ১৷৽ দেড় টাকা	আড়াই আনা

কুশদহর মানচিত্র (ম্যাপ) } মূল্য—।৵০ আনা

৩৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট কলিকাতা সমিতির কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

সূচী

(লেখক লেখিকাগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

"কুশদহ"র কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

১। কুশদহর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, সাধারণতঃ ১॥০ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যা ৵১০, নমুনার জন্যও ঐ, বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। বৈশাখ হইতে চৈত্র কুশদহর একবৎসর। বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলেও বৈশাখ হইতে কাগজ লইতে হয়।

সতর্কতার সহিত প্রতি মাসে ডাক ঘরে কাগজ পাঠান হয়। তবু কোন কোন গ্রাহকের কাগজ কখন কখন অপ্রাপ্ত সংবাদ পাওয়া যায়। আমরা তদন্তে জানিয়াছি, ডাক ঘরের ত্রুটী ও গ্রাহকগণের অনবধানতা এই দুই কারণেই এরূপ হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসের মধ্যে না পাইলে পর মাসের ১০ই মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে; বিলম্বে জানাইলে ৵১০ মূল্য দিতে হইবে।

৩। অপরিচিত লেখকের প্রবন্ধাদি সাধারণতঃ প্রকাশ করা যায় না। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান যায় না। যে কোন উত্তর জানিতে হইলে রিপ্লাই পাঠাইতে হয়।

৩। মূল্যাদি সম্পাদকের নামে ২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট কুশদহ কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হয়।

৪। বিজ্ঞাপনের হার—১ পেজ ৩৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ ২৲ টাকা। তিন


মোমস্পেক
বটিকা
ইহা দুর্ব্বলের বল,
নিস্তেজের তেজ, স্বাস্থ্য-
হীনের চিরস্বাস্থ্য, বৃদ্ধের-
চিরযৌবন, অশান্তির-
চিরশান্তি, নিরাশার পূর্ণ
আশা এবং প্রেমিক-
প্রেমিকার চিরবন্ধু ও
চির আদরের ধন। ইহার
একমাত্রায় মনোবাসনা
পূর্ণ হয়। এক শিশিতে
রোগক্লেশ দূর হয়।
মূল্য প্রতিসেট ২৸০ আনা।
ফাষ্ট কোয়ালিটী বৈদ্যুতিক
শক্তিযুক্ত ৫৸০ আনা।
মাশুল স্বতন্ত্র।
হাকিম মাসিহর রহমান।
ইউনানী মেডিকেল হল,
১১৪/১১৫, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট,
টেলিগ্রাফ ঠিকানা
বেগমবাহার কলিকাতা।
বিনামূল্যে রোগের ব্যবস্থা
ও ক্যাটলগ পাঠান হয়।
ইহা
রোগীর রোগক্লেশ
দূর করে ও বিলাসির
বিলাস বাসনা পূর্ণ করে
সেইজন্যই

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"তোমার জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য মা সাধিব"

দশম বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩২৫ { সপ্তম সংখ্যা

জাতীয় সঙ্গীত

—:০:—

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা।

শক্তি পূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হ'ত, চিরদিন ভারত,
শক্তি পূজে শক্তি হীন হ'ত না।
কেবল ডাকের গহনায়, ঢাকের বাজনায়,
শক্তি পূজা হয় না;
এক মন বিল্বদল, ভক্তি গঙ্গাজল,
শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়ে)
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন,
মা যে তাতে ভোলেন না;
কেবল জ্ঞান দীপ জ্বেলে, একান্ত ধূপ দিলে,
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা। (মা)
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা,
মা সে বলি লন না;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান দাও বিলাস বাসনা।
কাঙাল কয় কাতরে, জাত বিচারে,
শক্তি পুজা হয় না,
সকল বর্ণ এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।

—কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকির।

সত্যের পূজা

—:০:—

অচেতন জড়—অসত্যের পূজা করিয়া কোনও দেশ—কোনও জাতি কখন সজীব-একপ্রাণতা লাভ করিতে পারে নাই। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। কত দুর্ব্বল পতিত জাতিও উত্থানের পথে তখনই দাঁড়াইতে পারিয়াছে, যে পর্য্যন্ত তাহারা আধ্যাত্মিক-জগতের কোনও একটি সত্যের রেখা স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। বস্তুগত সত্য, গৃহীতার গ্রহণীয় শক্তি, দুয়ের সমবায়ে সত্য লব্ধ হয়। আলোক এবং দৃষ্টি-শক্তি দুইটির মধ্যে কোনটির অভাবে দর্শন-কার্য্য সম্পন্ন হয় না। হরিকে—রাম বলিয়া ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় না, যে হরিকে চায়, রামের দ্বারায় তাহার সে কাজ হইতে পারে না। একথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে পারা যায়, এই যে বঙ্গের শারদীয় দুর্গোৎসব যাহা এত বড় একটি জাতীয় মহোৎসব—যাহা বহুকাল চলিয়া আসিতেছে, ইহার দ্বারা জাতীয় জীবনগত্তই বলি—আর ব্যক্তিগত জীবনের দিক দিয়াই বলি—বাস্তবিক আধ্যাত্মিকতা লাভের পক্ষে কি সাহায্য হয়?

বোধ হয় এই কথার অবতারণা মাত্রেই অনেকে খড়্গ-হস্ত হইয়া বলিবেন, "পৌত্তলিকতা বিরোধী কথা ও-ত জানাই আছে, ও কথা আর শুনিবার প্রয়োজন কি?"

আমরা প্রথমেই বলিতেছি, বাস্তবিক আমাদের সে উদ্দেশ্য নয় যে, এই দেশব্যাপী একটি জাতীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে অযথা প্রতিবাদ করা; আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে দেশবাসীর মধ্যে যথার্থ সজীব-একপ্রাণতা আসে; প্রাণহীন—অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ভাব ও শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহার দিকে যদি একজনেরও দৃষ্টি পতিত হয়, তবে তদ্বারাও দেশের কল্যাণ হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা আমাদের সর্ব্বপ্রথমেই স্মরণ হয় যে, প্রকৃত পূজা-উপাসনা জিনিষটা কি? তাহা আন্তরিক না বাহ্যিক? উপাসনা বাহ্যিক হইতে পারে না, তাহাতে কোনই উপকার হয় না। জ্ঞানগত আন্তরিক উপাসনাই যথার্থ সত্যের সাধনা। জ্ঞানের উদয় না হইলে অনুতাপ আসে না, অনুতাপ না আসিলে পাপ ত্যাগ হয় না। মিথ্যা আচরণ—অভ্যাসগত পাপ পরিত্যাগ

করিতে হয় না, অথচ পূজা-পার্ব্বণে মত্ত হওয় চলে, এ প্রকার পূজাদির মধ্যে কি সত্যের পূজা হয় ? ইহা স্পষ্ট বাহ্যিক ব্যাপার নয় কি ?

দ্বিতীয় কথা, সত্য পূজা কাহাকে বলে ; সত্য কি ? তাহার সহজ সংজ্ঞা কি ? সত্য—যাহা যথার্থ, স্বরূপ বস্তু, অর্থাৎ বস্তুর যথার্থ রূপ—কিন্তু কোনও প্রকার কল্পনা নয় কিম্বা উপমাগত বস্তুও নয়। জ্ঞানযোগে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইয়া—প্রেমযোগে—বাধ্যতাযোগে তাঁহার নাম করিয়া যে আনন্দ—সে আনন্দেই ত চরিত্র শুদ্ধ হইয়া যায়, নতুবা কেবল বাহিরে উৎসবে মাতামাতি—কেবল বাহিরের আনন্দ—অবশ্য যাহারা তাহার অধিক আর কিছু জানে না, তাহারা তাহাকেই যথেষ্ট মনে করিতে [illegible] তাহা ত বিশুদ্ধ আত্মানন্দ নয়, উহা একটা সাময়িক ভাব [illegible]। চরিত্রের সঙ্গে, ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, তাহা হইলে কি উৎসবের মধ্যেও মানুষ দুর্নীতির কাজ করিতে পারে ? তাই পূজা আসিল, আবার চলিয়া গেল, জন প্রবাহ আবার স্রোতে ভাসিয়া চলিল—দুঃখ তাপ মোহ কিছুই কাটিল না। জ্ঞানী ভক্তগণ ঐ জাতীয় আনন্দের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তাই দেশব্যাপী বাহ্যিক পূজার ভীতরকার অবস্থা চিন্তা করিয়া দেশ-ভক্ত—সত্যের সাধক—কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির গাহিয়া গেলেন—

"শক্তি পূজা কথার কথা না।" ইত্যাদী (প্রথম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ভগবানকে বিন্দু মাত্রও ভালবাসিতে পারিলে প্রাণ কত পবিত্র হয়—প্রাণে কত নির্ম্মল আনন্দ লাভ হয়, তাহা যে কখন অনুভবও করে নাই, তাহাকে কি তাহা বুঝান যায়। অতএব যে বাহ্যিক পূজায় জ্ঞানোদয় হয় না, চরিত্র শুদ্ধি আনয়ন করে না—কয়েক দিনের বাহ্যিক আনন্দেই পর্য্যবসিত মাত্র, তাহা প্রাণ-প্রদ একপ্রাণতা দান করিবে কিরূপে। এইজন্য দেশবাসীর নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, এখন আর সেদিন নাই—এখন জাগিবার দিন আসিয়াছে, সকলে চিন্তা করুন জাতীয় উৎসবাদির ভিতর হইতে কি উপায়ে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হইতে পারে, নচেৎ কোনও দুঃখ দুর্গতি দূর হইবে না।

যদি কেহ বলেন, "দেশবাসীর মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে কি সত্যের সাধনা একেবারেই নাই, এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন ? সত্যের সাধনা দেশব্যাপীভাবে একদিনেই যে হইবে ইহা কি কখনও সম্ভব ? ধর্ম্মজীবন লাভ

করা কি কাহারও হাত ধরা, যে ইচ্ছা করিলেই আজ দেশশুদ্ধ লোক সত্যের সাধনা করিবে ? এই জন্যই ত সমবেত ভাবে জাতীয় উৎসবাদির সৃষ্টি।

আমরা বলি এ কথার মধ্যে অবশ্য কিছু সত্য আছে। ব্যক্তিগত সাধনা— যেমন নাম জপ, নাম সঙ্কীর্ত্তন অথবা ক্রিয়া যোগ প্রভৃতি সাধন আছে। কিন্তু তৎসম্বন্ধেও আমরা এখানে সত্যের অনুরোধে একটি ইঙ্গিত করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ঐ সকল সাধনার মধ্যে জ্ঞানের উৎকর্ষ, কার্য্যোদ্যম, একপ্রাণতা, জন-সেবার ভাব তেমন পরিস্ফুট দেখা যায় না। সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে সংকীর্ণতা বদ্ধমূল হইয়া যাহা আছে, তাহারও পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

তারপর দেখিতে হইবে যত প্রকার পূজানুষ্ঠানাদি চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কত অর্থ ব্যয়—কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে কয় জনের প্রাণে প্রকৃত ধর্ম্ম-চিন্তা—তত্ত্ব জ্ঞানোদয়, বিবেক বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়—সম্ভবতঃ একজনেরও নয়। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহাতে বর্ত্তমান সময়োপযোগী দেশের কতটুকু উপকার হয়। অন্যদিকে দিন দিন শিক্ষিত বাঙ্গালী এই সকল অনুষ্ঠানের প্রতি ভিতরে ভিতরে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাই পূর্ব্বে যে পরিমাণে এই সকল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত এখন আর তাহা হয় না। যদি বলেন, অর্থাভাবে এখন এইরূপ হইতেছে,— না, তাহা বলা চলে না, আগে ইহাপেক্ষা সামান্য অবস্থার মধ্যেও অনেক পূজা-পার্ব্বণ হইত, এখন তাহা হয় না। তাহার একমাত্র কারণ অনুরাগ এবং বিশ্বাসের অভাব। তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী পূজার অবকাশে দেশ ভ্রমণে তৃপ্ত। আমরা বলি ইহা দূষনীয় বা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এমন করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম-জীবন "যবস্থব" অবস্থায় কি চিরদিন চলিতে পারে ? একটা অবস্তাব অবস্থা লইয়া একটা জাতীয় কখনই উন্নতি হইতে পারে না। উন্নতির পথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল খাঁটী ধর্ম্মবিশ্বাসের বল। আমাদের বিশ্বাস এই বাঙ্গালী জাতীর নাম যদি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইবার হেতু না থাকে, তবে অবশ্যই বিধাতার বিধান-শক্তিতে একদিন জাতীয়জীবনে প্রকৃত খাঁটী ধর্ম্মবিশ্বাসের বল আসিবেই। বিধাতা সেই দিন আনয়ন করুন।

ভ্রমণের সার্থকতা

আমাদের দেশের লোক যেমন কূপ-মণ্ডূক হইয়া বাস করিতে ভালবাসেন, অধুনা পৃথিবীর অন্যত্র কুত্রাপি এমন দেখা যায় না। যদি কেহ কথা পাড়েন, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কেহ কেহ তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহারই বড়াই করিয়া থাকি—কিন্তু নিজেরা যে ঐ সকল স্থান মানচিত্রে ব্যতীত দেখি নাই, তাহাতে আদৌ লজ্জিত হইনা।

বাঙ্গালী বিহারে গেলে, পূর্ব্ববঙ্গের লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিলে তাহাই বিদেশ হইয়া পড়ে, বিহারী বাঙ্গালায় আসিলে ভয়ানক পরদেশ হইয়া পড়ে; কিন্তু আজকাল পৃথিবীতে যাঁহারা মানুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশ ছাড়িয়া, কত ভয়ঙ্কর নদ, নদী, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া, কত শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমিকে অবজ্ঞা করিয়া, জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়াছেন, আপনাকে ধন্য ও মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, একথা প্রকৃতভাবে এদেশের লোক কয়জন ভাবেন বলিতে পারি না। স্বপ্নের চিন্তার মত এ সকল কাহারো মনে উঁকি ঝুঁকি না মারে এমন নয়, কিন্তু স্বপ্নের ভাব স্বপ্নেই মিলাইয়া যায়, তাহা কাহারো বাস্তব জীবনে দেখা যায় না!

ঘরমুখো কেবল বাঙ্গালী নয়, আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারতের লোকের প্রকৃতিই এই। যদিও বোম্বের পার্শি, ভাটিয়া, সিন্ধি প্রভৃতি জাতিকে ব্যবসায়-কল্পে আজকাল জাবা, সিঙ্গাপুর, হংকং, কলোম্বো, মরিসস, ইয়োকোহামা, কোবে, এডেন, সুয়েজ, এলেকজান্দ্রিয়া ও ইউরোপের কোন কোন স্থানে বাস করিতে দেখা যায়, কিন্তু ভারতের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড দেশের লোকসংখ্যা হিসাবে দেখিতে গেলে তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য।

ভ্রমণ সম্বন্ধে যে জাতি আপনার সমাজে উৎসাহ না পায়, সে জাতি কস্মিন্‌কালে জগতে মাথা তুলিয়া চলিতে পারে না—কোনও কালে সে জাতির উন্নতি সম্ভব হয় না। শাস্ত্রীয় শাসন বা যুক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আবহমান কাল সাধারণ চলিত কথায়ও বিদেশ ভ্রমণকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হইয়াছে। সমুদ্র যাত্রা করিলে সপ্তম পুরুষের সম্বন্ধে রক্ষিত জাতি (Caste)

নষ্ট হয়, এমন কি বিদেশে না যাইয়া স্বদেশের ভিতর বেড়াইলেও সমাজ "ভবঘুরে" উপাধি দিয়া থাকেন, সুতরাং এমন স্বর্গীয় (Home comforts) গার্হস্থ্যসুখ বিসর্জ্জন দিয়া কে অর্থ ব্যয় ও অজস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া সমাজের অপ্রিয় হইবেন? বলা বাহুল্য, তাহার ফলে ভারতের উদার আধ্যাত্মিকতার আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আছে, জাতীয় জীবন (Life instinct of a nation) সম্পূর্ণ অপরিস্ফুট রহিয়াছে, শিল্প, বাণিজ্য আদৌ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যদিও ভারতবর্ষের এ সকল অমুন্নতির সম্বন্ধে যথেষ্ট কারণ আছে—তথাপি ভ্রমণশীলতার অভাব যে তন্মধ্যে একটি প্রধান বিষয়, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ইহা সহজে বুঝিতে পারেন।

ভ্রমণে আধ্যাত্মিকতা—ভ্রমণের আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। যদি বিধাতার রাজ্যে স্বর্গীয় উপভোগের বস্তু কিছু থাকে, তবে একমাত্র ভ্রমণ হইতেই তাহা পাওয়া যায়। যদি স্বর্গরাজ্যের সুষমা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাও, যদি গমন-সম্ভব অপরিসীম জল, স্থল ও বায়ু-মণ্ডলের যেখানে বিশ্বশিল্পীর যে সকল অত্যদ্ভুত রচনাবলী আছে, তাহা দেখিয়া ক্ষুদ্র মানব জীবনকে ধন্য করিতে চাও, তবে বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন দেশের প্রকৃতির মনোহারিণী মূর্ত্তি, গিরি, নদ, নদী, প্রস্রবণ, জলোধি-কল্লোল ও অনিল-পথ দেখিয়া আইস—সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া যাইবে। এখন গৃহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা হইতেছে না—তখন গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করিবে না, দূর হইতে দূরান্তরে ছুটিয়া যাইবে।

তুমি বাঙ্গালী—সম্ভবতঃ বলিয়া বসিবে, 'বিদেশে যে কষ্ট—কি করিয়া ভ্রমিব?' মনে রাখিও, এই ভীরুতাই তোমার জীবনের ভীষণ শত্রু। একবার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখ—তোমার কষ্ট নিবারণ করিতে কিরূপ দয়ার্দ্র চিত্তে, তোমার শ্রান্তি দূর করিতে কিরূপ সুশীতল বায়ুর ব্যজন হস্তে, তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে কিরূপ অপূর্ব্ব মনোহারিণী বেশে প্রকৃতি তোমাকে অভ্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তুমি শ্রীকৃষ্ণ, নানক, চৈতন্য, মহম্মদ, যীশু, বুদ্ধ প্রভৃতি যে মহাত্মারই শিষ্য (follower) হওনা কেন, যাঁহার অবর্ণনীয় ঐশী শক্তির প্রভাবে স্বভাবের সৌন্দর্য্যে তুমি অপরিসীম কষ্টের ভিতরেও এই প্রকার বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছ, তখন তাঁহার চরণে তোমার মস্তক আপনাআপনি বিলুণ্ঠিত হইবে।

আগ্রার তাজমহল, সাইপ্রাসের কলোসাস, টৈবসের ভগবন্ত, চীনের

প্রাচীর, আদি অদ্ভুত অচিন্তনীয় কীর্ত্তিকলাপ বা লণ্ডন, প্যারী, ইয়োকোহামা, নিউইয়র্ক প্রভৃতি মনোরম আধুনিক প্রধান প্রধান সহর সকল দেখিয়ে মানবাত্মার ভিতর দিয়া বিধাতার অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়া তুমি নিশ্চিত বিমুগ্ধ হইবে। অথবা নায়গারার জল প্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎগম, সাগরের অহর্নিশি উদ্বেলন দেখিয়া স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের বৈচিত্র্যে তোমার প্রাণ বিস্ময় রসে আপ্লুত হইয়া যাইবে।

শান্ত তুমি, নিরাময় তুমি, নির্ব্বিকার তুমি, তোমার প্রাণ বিশাল প্রকৃতি গম্ভীরতা ও নিস্তব্ধতায় মিলিত হইয়া ভগবানে বিলীন হইতে চায় না— কিরূপে বিশ্বাস করিব ? সৌন্দর্য্য অন্বেষী, রূপরস গ্রাহী, সজ্ঞান, সহৃদয় তুমি তোমাকে বিদেশ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এ কি আশ্চর্য্য ! "নাল্পে সুখমস্তি—যো ভূমান্ তৎ সুখম্" এই ঋষিবাক্য শুনিয়াও ঐ নীলাকাশের অসীম সীমানায় স্বাধীনতা-পাখা লইয়া তোমার প্রাণপাখী উড়িয়া বেড়াইতে চায় না, তোমার সমাজ তোমার পাখা কাটিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করে, তোমার কুসংস্কার তোমায় কুঠারাঘাতে পঙ্গু করিয়া দেয়, তুমি গয়া, কাশী পর্য্যন্ত যাইয়া গৃহে ফিরিয়া আইস—তুমি এই ক্ষুদ্র স্বভাবের দাস হইয়া ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সেই অচিন্ত্য বস্তুকে লাভ করিবে, এই কি তোমার বিশ্বাস ?

দশ মাইল দূর সমুদ্র হইতে পরিদৃশ্যমান পুরীর অত্যুচ্চ ভুবনেশ্বরের চূড়া; বিশালগগণস্পর্শী, স্বর্ণকায় ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ পগোদা সকল ; প্রাসাদ সদৃশ, প্রকাণ্ড গম্বুজ বিশিষ্ট বিভিন্ন দেশে ইস্‌লামীয় মসজিদ্ ; ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবে, জেরুজেলামের চার্চ্চ, সেন্ট হেলেনার ক্যাথিড্রাল প্রভৃতি অভ্রভেদী চূড়া-বিশিষ্ট, সুশোভন, অতিকায় ধর্ম্মমন্দির সকল স্বচক্ষে দেখিলে, অবিশ্বাসীর প্রাণেও ভগবৎ-ভক্তির উদ্রেক হয়। ধর্ম্ম-বিশ্বাস পৃথিবীতে এযাবৎকাল মানব প্রাণকে কিরূপ আয়ত্ত করিয়া আছে, এ সকল তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ভগবৎ-শক্তি মানুষের প্রাণে সহজে ক্রিয়া না করিলে, তাহার প্রাণকে উদ্বুদ্ধ না করিলে, কখনো এই প্রকার স্বর্ণরৌপ্য খচিত, সুবিশাল ধর্ম্ম মন্দির সকল প্রচুর অর্থ ব্যয়ে, অভাবনীয় শিল্পনৈপুণ্যে নির্ম্মিত হইত না।

ইউরোপ যাইবার সময় আমরা একবার সমুদ্র গর্ভে প্রচণ্ড ঝড়ের ভিতর পড়িলাম। বিশাল সমুদ্রের তুলনায় একখানা বড় জাহাজ অতিক্ষুদ্র। জাহাজে কয়েকজন ইউরোপীয় প্রবীণ জ্ঞানী প্যাসেঞ্জার ছিলেন ; ইঁহারা আমেরিকা হইতে স্বদেশে যাইতেছেন। একজন আমেরিকান মেথডিষ্ট

মিসনের পাদরী ও অপর জন কোন পাশ্চাত্য বড় কলেজের প্রফেসর, হারবার্ট স্পেনসরের মতাবলম্বী, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান (agonostist)। ঝড়ের পূর্ব্বে ইঁহাদের উভয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছিল। প্রফেসর কিছুতেই স্বীকার করিবেন না—ঈশ্বর আছেন। পাদরী কিছুতেই মানিবেন না—ঈশ্বর নাই। অবশ্য দুইজনই শিক্ষিত, জ্ঞানী পুরুষ, সুতরাং ইঁহাদের তর্কযুক্তি শুনিতে অন্যান্য প্যাসেঞ্জারগণ জড়ীভূত হইয়া গেল। স্পেনসার যে বলিয়াছেন Invincible force working on our head "এই অদৃশ্য শক্তিকে যদি ঈশ্বর ক... তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু ... প্রকৃতিরই (nature) ক্রিয়া, প্রকৃতিকে বাদ দিলে ঈশ্বর বলিয়া একটা স্বতন্ত্র ... পাওয়া যায় না" ইহা প্রফেসর যুক্তিতে দেখাইলেন: "প্রকৃতির আপনার কোন শক্তি নাই যে সে ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন চলিতে পারে; সেই অনন্ত শক্তির দ্বারাই প্রকৃতির শক্তি পরিচালিত হইতেছে!" পাদরী নিবেদন করিলেন। "বিশেষ শক্তি (force) কথা দ্বারা অনন্তরূপী ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। তিনি দয়ার সাগর, গুণের সাগর, কেবল শক্তির সাগর নহেন। তাঁহার করুণা ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না।" এ সকল কথা পাদরী যখন বলিতেছিলেন, দার্শনিক প্রফেসর "কবির কল্পনা" বলিয়া মনে মনে তাঁহাকে উপহাস করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে সহসা আকাশ প্রগাঢ় মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, সুনীল সমুদ্র জল ধোঁয়ায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। জাহাজের মাস্তুলে danger signal (বিপদ-পতাকা) উঠিল। প্রচণ্ড ঝড় জাহাজ খানাকে প্রতি মিনিটে ডুবাইয়া, ভাসাইয়া, নাচাইয়া ইহার ধ্বংসের চেষ্টা করিতে লাগিল। ধ্বংসোন্মুখ জাহাজের কাপ্তানের আজ্ঞায় যাত্রীর প্রাণ রক্ষার্থ (life boat) লাইফ বোট সকল জলে নামান হইল, কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ উর্ম্মি-রাশির অত্যধিক ঘাত প্রতিঘাতে লাইফ বোট জলে নামাইবার পূর্ব্বেই ষ্টীমার হইতে কতগুলি প্যাসেঞ্জার হঠাৎ ভূমধ্যসাগরের অতল জলে পড়িয়া গেলেন। দুঃখের কথা তন্মধ্যে সেই সন্দেহবাদী প্রফেসর মহাশয়ও ছিলেন। "ভগবান ত নাই—তবে এই ভীষণ বিপদ সময় সমুদ্র গর্ভ হইতে কে তোমায় রক্ষা করিবে," তেমন মুখর লোকেরা সমুদ্রের স্বাভাবিক অবস্থা হইলে নিশ্চয় তখন

তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত; কিন্তু সকলেই তখন আপনাপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত—কাজেই এ প্রশ্ন উঠিল না।

সমুদ্রে যত প্রচণ্ড ঝড়ই হউক না কেন আধুনিক জাহাজকে ডুবান বড় শক্ত ব্যাপার; ফলতঃ হাজার গণ্ডা হাঁবুডুবু খাইয়াও জাহাজ ডুবিল না—কতগুলি যাত্রী অসাবধানতা বশতঃ জলে পড়িয়া কোথায় কোন্ দিকে পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউর মুখে ভাসিয়া গেল, নাবিকেরা (Officers) দূরবীক্ষণ দিয়াও সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। অবশেষে সমুদ্রের স্বাভাবিক ভাব হওয়ার পরে প্যাসেঞ্জার লিষ্ট ধরিয়া ঠিক করা গেল পাঁচ জন লোক জলে পড়িয়াছে। তাহারা পড়িতে না পড়িতে [illegible] লাইফ বোয়া) সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যেন [illegible] সাতার [illegible], যাহারা সাতারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহারা তাহার উপর ভর করিয়া জীবন বাঁচাইতে পারে। কিন্তু তাহা কাহারো ভাগ্যে জুটিল—কাহারো ভাগ্যে আদৌ জুটিল না—কেহ স্রোতের মুখে দশ মাইল অন্তর ভাসিয়া গেল। কিন্তু দিবা ভাগে এই ঘটনা হওয়ায় তবু অনেক চেষ্টায়—কাপ্তানের অক্লান্ত পরিশ্রমে চারিজনকে লাইফ বোট সাহায্যে সুদূর হইতে তুলিয়া আনিয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচান গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল কিন্তু আর একজনের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। অবশেষে সকলেই প্রায় তাঁহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেলেন—তিনি আমাদের সেই প্রফেসর!

প্রাণপণে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া কাপ্তান জাহাজ গন্তব্য পথে চালাইলেন, কিন্তু রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সমুদ্রগর্ভে দেখিলেন একটা উজ্জ্বল আলো (flash light) জ্বলিতেছে। দেখিয়া স্থির করিলেন, তাঁহার (life boa) লাইফ বোয়া যুক্ত বাতি ছাড়া আর কিছু নহে, (আধুনিক বোয়াতে এক প্রকার ট্রিগার বাতির বন্দোবস্ত থাকে, তাহাতে সজোরে ধাক্কা দিলে তাহা হইতে আলো নির্গত হইয়া সমুদ্রে ভাসিতে থাকে) কাপ্তানের তাহা দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সেখানে সমুদ্রে পতিত কোন বিপদগ্রস্ত জীবন আছে। কাপ্তান দিক ফিরাইয়া সযত্নে সেই বোয়ায় ভাসমান অর্দ্ধমৃত মানুষকে আপনার জাহাজে তুলিলেন। কাপ্তান কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারিলেন না—এই লোক তাঁহারই জাহাজের প্যাসেঞ্জার; তাঁহার ধারণা এ লোক কোন জাহাজের যাত্রী। তাঁহার জাহাজের পতিত প্যাসেঞ্জারের এতদূরে জীবিতাবস্থায় ভাসিয়া আসা অসম্ভব।

অফিসারগণ কাপ্তানের আজ্ঞানুসারে খালাসীদের দ্বারা বোয়া সংলগ্ন উদরে রাশিকৃত সমুদ্রের জলপূর্ণ সেই অর্দ্ধমৃত জীবনকে অতি যত্নে জাহাজের ডেকে তুলিলেন। জাহাজের ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জনতা হইতে পৃথক ক্যাবিনে লইয়া যাইয়া নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহার উদরস্থ জল নির্গত করিবার চেষ্টা করিলেন প্রায় এক ঘণ্টা কাল তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না; তারপর যখন তিনি অর্দ্ধস্ফুটস্বরে দু' এক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সহযাত্রীরা (যাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথন হইতেছিল) তাঁহাকে [illegible] যে তিনি [illegible] সন্দেহ যাত্রী প্রফেসর। প্রফেসরও তাঁহার সহযাত্রী[illegible] ধীরে ধীরে বলিলেন — My friends, let me tender [illegible] thanks [illegible] God that He gave me an oppoitunity to be convinced of His greatness and omnipresense through this calamity that befell me quite unexpectedly and through Whose grace I have been saved. (বন্ধুগণ, আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি তাঁহার মহত্ত্বতা ও সর্ব্বব্যাপকতা বুঝাইবার জন্য অভাবনীয় দুর্ঘটনায় আমাকে ফেলিয়াছিলেন আবার তিনিই দয়া পরবশ হইয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন)।

"ভ্রমণে জাতীয় জীবনের বিকাশ" সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

কীর্ত্তির ডাকাতি

(ছোট গল্প)

কীর্ত্তি, আজ তোর ডাকাতির গল্প বল্, চুণীদি, শুন্‌বে।

কীর্ত্তি কহিল, রোজই তো বলি দিদি, শুনে তোদের ভয় লাগে না? আমার একটা নাতনী ছিল, সে তো শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে আমার বুকে মুখ লুকুতো।

চুণীর বয়স বছর বারো, সে একটু পিছু হটিয়া কহিল, আর থাক্, ও গল্প আর শুন্‌ব না, তোর ছোট্ট ঠান্‌দির কাছে বেহুলা লক্ষীন্দরের গল্প শুনিগে চল্।

শান্তি ভয় পাইবার মেয়ে নয়, ঠাকুরমার ঝুলির আর বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্পে তার অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, তার চাইতে কীর্ত্তির গল্পে বেশ নূতনত্ব আছে। আর এতো গল্প নয়, এ একেবারে সত্যি ঘটনা। কীর্ত্তির অতীত জীবনের কাহিনী। শান্তি চুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, ভয় করছিস্ কেন চুণীদি, কীর্ত্তি ডাকাত গেলেও এখন তো আর ডাকাতি করে না, এখন ও খুব ভাল হয়েছে ও আমাদের কত ভালবাসে, ওরা যাদের বাড়ীতে একদিন নুন খায়, তাদের কখখনো অনিষ্ট করে না, না কীর্ত্তি ?

কীর্ত্তি নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতের চেটোয় তামাকুর পাতায় চুণ দিয়া ঘষিতে লাগিল। তাহার মনে হইল একদিন সে ... পরম গৌরব অনুভব করিয়াছে, যাহার ভয়ে দেশের ধনী ... সকলেই ভীত, ত্রস্ত থাকিত, তাহার সাকরেদী করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে কত লোক আসিয়া শরণাপন্ন হইত, অথচ আজ একটি ... শঙ্কিত ভীত ভাবে তাহার মনে আঘাৎ করিল কেন ?

আট বছরের মেয়ে শান্তি, এই বিশাল বপু, সুদৃঢ় ... কৃষ্ণকায় লাঠিয়াল কীর্ত্তিকে খুব ভালবাসিত। পুরাতন দস্যুর পাথরের কলিজায় যে এই কুসুম সুকুমার বালিকাটির জন্য একটি স্নেহের উৎস সৃষ্ট হয় নাই তাহাও বলিতে পারি না। শান্তি দেউড়ীর ভিতরে বেঞ্চিতে বসিয়া কহিল, শুনে নে চুণী দি, এমন মজার গল্প আর শুনতে পাবি না, আমি তো রোজই শুনি। তোরা তো ১দিন পরে চলে যাবি। বলনা কীর্ত্তি—তোর গল্প আরম্ভ কর, চুণীদির শুনতে খুব মন আছে, কেবল ভয় ভয় করছে।

মুখের মধ্যে দোক্তা পুরিয়া হাত ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভূমি হইতে মোটা চকচকে লাঠিটা তুলিয়া লইয়া কীর্ত্তি কহিল, এই লাঠি আমার গুরুর দেওয়া, এই লাঠি আমার চিরদিনের সাথী, এই হাতিয়ার নিয়ে কত দেশ বিদেশে ডাকাতি করে বেড়িয়েছি, কতজনার মাথা ফাটিয়েছি, পা ভেঙেছি, তারপর যখন আমার পৃথিবীতে আপনার বলতে আর কেউ রইল না তখনও এই লাঠিই আমার সঙ্গী—একে নিয়ে আপনাদের দুয়োরে চাকরী করতে এসেছি।

চুণীর ভয় ক্রমশ ভাঙিয়া আসিতেছিল, উৎসুক্যও বাড়িয়া চলিতেছিল, সে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি ভারী নিষ্ঠুর; মানুষের হাত পা মাথা ভাঙতে তোমার একটুও মনে ব্যাথা লাগতো না ?

কীর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল, বড় বড় রুই কাত্‌লা মাছ ছিপে উঠ্‌লে তোমাদের মন কত খুসী হয়, মনে ব্যথা লাগে কি ?

চুণী তাড়াতাড়ি কহিল, "বাঃ ওরা যে মাছ খাবার জিনিষ।

কীর্ত্তি কহিল, তোমাদের দরকার পড়ে বলে ঐ বাহানা কর্‌ছ, আমাদের সেই রকম বাহানায় নিষ্ঠুর কাজ গুলো অক্লেশে কর্‌তে মনে ব্যথা লাগ্‌তো না। কিন্তু আমার এক নাত্‌নী এসে সে সব গোলমাল করে দিলে। আবাগীর বেটী নিজেও বাঁচলো না. আমাকেও পথে বসিয়ে গেল।

শান্তি অসহিষ্ণু ভাবে কহিল, গোড়া থেকে বল্‌না কীর্ত্তি, তা না হোলে চুণী দি বুঝ্‌বে কি করে?

ছোট বেলা থেকে খুব ডাকাবুকো হয়ে পড়ে ছিলুম। আমাদের গাঁয়ে তখন অনেক ঘর হিন্দু মুসলমানের বাস ছিল। মহরম আর কালী পূজোর সময় ভারী লাঠি খেলার ধূম হোতো, তিন বছর উপরি উপরি যে লাঠি খেলায় জিত্‌তে পারত, সে সবার বড় হোতো। আমি যখন লাঠি খেলায় কবারই জিত্‌তে পারলুম, আমার খুব কদর বাড়্‌লো। তারপর সে অনেক কথা—তোরা অতো শুনে কি কর্‌বি দিদি আমি একজন পাকা ডাকাত হোয়ে দাঁড়ালুম। দলের মধ্যে,আমায় সবাই খুব মেনে চল্‌তো সর্দ্দারও আমায় খুব ভাল বাস্‌ত। একবার একটা খুব বড় ডাকাতিতে সর্দ্দারের হাতে একজন স্ত্রীলোক পড়ে, সর্দ্দার সেবার থেকে কেমন যেন হয়ে গেল, আর ডাকাতি কর্‌তে যেতে চাইত না, আমাদের তখন যোয়ান বয়েস ঘরে বসে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ত না। বন জঙ্গল ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সময় বুঝে ডাকাতি কর্‌তে যেতে খুব উৎসাহ বোধ হোতো। একবার একটা খুব দাঁও বুঝে আমরা সকলে গিয়ে সার্দ্দারকে ডাকাতি করতে যাবার জন্যে ধরলুম্। সর্দ্দার কিছুতেই রাজী হোলো না, অনেক পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, ভাখ আর তোরা আমায় বিরক্ত করিস না, আমি ও কাজ ছেড়ে দিলুম। যা রোজগার করিছি, ঐ রেখে খেতে পার্‌লে সাত পুরুষ খাবে। তোরা কীর্ত্তিকে সর্দ্দার করে নে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস্, এ বড় পেছল রাস্তা, সাম্‌লে চলিস্ ঝোপ্ বুঝে কোপ মারিস্, আর পুঁটি মাছের লোভ করিস না, বড়

কাৎলা রুই যখন পারবি ধরবি, মেয়ে মানুষের গায়ে খবরদার হাত দিস্ না, ছোট ছেলেপিলেদের মারিস্ না। আর একটা কথা, আপোষে দলের মধ্যে মিল রেখে চলবি—ঝগড়া ঝাঁটি রাখালেই সর্ব্বনাশ। এই বুড়ো সর্দ্দারের শেষ কথা গুলো মনে রেখে কাজ করিস্। আমার কাছে আর কেউ আসিস্ না, আমি এখন বুড়ো বয়েসে হরি নাম করবো, অনেক পাপ করিছি, আর না।

গল্পের গতিকে বাধা দিয়া চুণী প্রশ্ন করিল, হ্যা কীর্ত্তি, পরের ধন কেড়ে নিলে পাপ হয়, এটা কি তোমাদের মাথায় আসৃত না?

কীর্ত্তি কহিল, মাথায় এলেও সে কথা মানছে কে দিদি! এক রাজা যখন আর এক রাজ্যের প্রজাদের ধনে প্রাণে মেরে ফেলে রাজ্য কেড়ে নেয় তখন সেটাকে বলে যুদ্ধ জয়! আর আমরা যা করতুম তোরা তাকে বল্‌ছিস্ ডাকাতি। যে যত যুদ্ধ করতে পারবে, যতগুলো মানুষ মারতে পারবে, তার খুব সুখ্যাতি হবে, সে বড় বীর বোলে, সবাই তাকে মানবে, তা তোরা আমার ডাকাত বলে ঘৃণা করলেও দলের লোক আমায় খুব খাতির করত, তারপর শোন্।

আমি বিয়ে থা করলুম্ আমার একটা মেয়ে হোলো। গাঁয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতুম, আমার বাবা খুব পাকা মিস্ত্রী ছিল। আমারও হাত খুব ভাল হোলো। আমার গাঁথনি সবাই পছন্দ করত, অনেকে আমার কাছে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখ্‌ত। অনেক দূরে দূরে বড় বড় পাকা ইমারৎ মেরামত করিবার জন্যে আমার ডাক্ আসত।

আমি আবার কিছু কিছু ঝাড় ফুঁকও জানতুম, ছেলে বুড়ো কারো ওপর, ওপর নজর হোলে ভাল করে দিতুম, সবাই আমায় মানতও খুব। ভদ্দর লোকের বাড়ীর গিন্নিরাও ছেলেদের অসুখ বিসুখ করলে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঝাড়্‌তে বলতেন।

দুটো বড় বড় ডাকাতীতে গিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা লুটে আনলুম্, আমরা গয়না পাতি আনতুম্ না, কেবল নগদ টাকা আর গিনি, মোহর এই সব আনতুম। আমার স্ত্রী বুধি ছিল ভারী ভালমানুষ আর বোকা, কাজেই তাকে কখখনো কিছু বলতুম না, ডাকাতী করতে যাবার সময় বলতুম কাজে যাচ্ছি, যে দিন ফিরতুম, তাকে মদ খাইয়ে নেশায় ভোর কোরে রেখে তবে মাটী খুঁড়ে টাকা কড়ি পুঁতে রাখতুম। নিজেরা খুব বুঝে চলতুম, পাছে কেউ সন্দেহ করে, সে জন্যে খুব ভাল খেতুম না ভাল পরতুম

না, মেয়েটাকে গয়না কাপড় যখন যা চাইত তাই দিতুম, সেটার নাম ছিল খুকনী, আমাকে ভারী ভাল বাসত তাকে ছেড়ে এদানীং বড় বেশী কোথাও থাকতে পারতুম না।

গল্প শুনিতে শুনিতে ডাকাতের প্রতি চুনীর যতই অশ্রদ্ধা ও ভয় বাড়িয়া চলিতেছিল, তাহার কৌতুহলও সেই পরিমাণ বাড়িতেছিল, ভয়ের স্বভাবই এই যে ভয়ানক বস্তুটিকে বার বার ফিরিয়া নিরিখ পরখ করা। চুনী আবার তাই প্রশ্ন করিল, পাড়ার লোকের বাড়ী সিঁদ দিতে না?

কীর্ত্তি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিল, আমরা তো চোর নই যে সিঁদ দোবো। আমরা লুকিয়ে কোনো জিনিষ নিতুম না, আগে থাকতে চিঠি পাঠিয়ে তবে আমরা ডাকাতী করতে যেতুম। আমরা গাঁ ঘরে কখনো লুটপাট করতুম না, দূর দূরান্তরে ডাকাতি করতে যেতুম। যাদের সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করি, হাসি কথা কই, উঠি বসি তাদের কখনও সর্ব্বনাশ করতে পারি? তবে এক জনের বাড়ী অনেক টাকা আছে শুনলেই আমাদের লোভ হোতো। দুজনে দশলাখ জমিয়ে রাখবে আর কেউ বা একটা টাকার মুখ দেখতে পাবে না, সে আমাদের বরদাস্ত হোতো না। অমনি সাজ গোজ করে লুটতে যেতুম। ফেরবার পথে দুহাতে বিলিয়েও কিছু দিতুম। আমার দলের কেউ কেউ আবার সেটা পছন্দ করতো না, তবে মুখ ফুটে আমায় কেউ কিছু বলতেও পারত না।

আমাদের গাঁয়ে মিত্তির বাবুরা আর বোস বাবুরা মামা ভাগ্নে সম্পর্ক ছিল। তাদের দুদলে ভারী একটা আড়াআড়ি চলতো। সামনা সামনি কেউ কিছু না কোরে আড়ালে আবডালে কত কেলেঙ্কারীই করতো। দুপুরের বেলা কেউ ওদের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ছেঁকে নিত, কেউ বা তার ওপোর রাত্তিরে একাটি গিয়ে তাদের পুকুরের জলে এমন জিনিষ ফেলে দিত যাতে তার পরদিন সমস্ত পুকুরের মাছ ভেসে উঠে খাবি খেতো। কেউবা ওর পুকুরের মুখ কেটে মাছ বের করে দিত, আবার কেউ বা তার শোধ নেবার জন্য ওপক্ষের ধান জমীর বাঁধা আল গুলো রাত্তিরে সব কেটে দিয়ে জল বের কোরে ফসল মারবার চেষ্টা করতো। দু দলেই মাইনে করা সব লেঠেল ছিল। একবার খানিকটা ধান জমীর দখল নিয়ে কি লাঠালাঠিই না হোলো, ব্যাপার দেখে আমার হাসি আসতো। মনে মনে একটু সান্ত্বনাও পেতুম, ওদের চাইতে আমরা বেশী কিছু নীচু কাজ করিনা, আপন রক্তের সম্পর্কের

লোকের সঙ্গে তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে. লেখা পড়া জানা ভদ্দর লোকেরা যদি এই কাণ্ড কর্‌ছে, তখন আমরা মুখ্‌খু ছোট লোক আর কত ভাল হব?

আমাকে তো দু দল থেকেই লেঠেল রাখ্‌তে জেদ্‌ করেছিল. আমি কিন্তু কোনো দলেই যেঁসিনি, একবার যখন দু দলে খুব লাঠালাঠি হচ্ছে শুন্‌লুম, তখন আমার এই সর্দ্দারের দেওয়া লাঠিটি নিয়ে গিয়ে হাজির হলুম, লাঠি লুফে নিয়ে বুক ঠুকে বললুম, তোরা দুই দলে লাঠি চালা, আমি মাঝখানে লাঠি চালাবো।

দুই দলে তাল ঠুকে, বুক ফুলিয়ে লাঠি চালাতে সুরু কর্‌লে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি লাঠি খেলা আরম্ভ করলুম। লাফিয়ে নেচে. ঘুরে ফিরে ডাইনে বাঁয়ে এমন লাঠি ঘুরুতে আরম্ভ করলুম. যে আমার লাঠিকে ডিঙিয়ে কেউ কারো লাঠিকে মার্‌তে পারলে না, অবাক হোয়ে সব আমার লাঠি খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল, বড় বড় লেঠেলরা লাঠি ফেলে, আমার সাম্‌নে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, সাবাস লাঠি ধরেছ কীর্ত্তি, এমন লাঠি খেলা কখনও দেখিনি. তোমার সাম্‌নে লাঠি ধরে আমরা ছেলে খেলা করিছি; ছোট বড় সবাই বাহবা দিতে লাগ্‌ল. কেউ কেউ বল্‌লে ও যে জাদু জানে, ওতো খেলার বাহাদুরী নয়, যাদুর গুণ

দু চারটে বড় বড় ডাকাতীর পর আর কোথাও যেতুম না। কিন্তু দলের লোকগুলো ছিল ছিনে জোঁক, ব্যাটাদের খাঁই আর কিছুতে মিটুতে চায় না। আমি যেতে না রাজী হওয়ায় তাদের মধ্যে দলাদলি সুরু হোলো। এক দল আমাকে বাদ দিয়েই ডাকাতীতে যেতে চাইত আর একদল এগুতে চাইত না। আমার তখন সর্দ্দারের কথা মনে হোলো। কিন্তু উপায় কি? তারপর হঠাৎ শুনলুম, এক জায়গায় ডাকাতী কর্‌তে গিয়ে দু জন ধরা পড়ে গেছে। তাদের কপাল জোর ছিল, কি রকম কোরে খালাস পেয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদল আমার নামে পুলিশের কাছে বেনামীতে চিঠি দিতে সুরু করলে, পুলিশ হঠাৎ একদিন আমার বাড়ী খানাতল্লাসী কর্‌তে এলো, আমি আমার লাঠি নিয়ে যেমন দাঁড়ালুম ৪।৫টা কনেষ্টবলই রণে ভঙ্গ দিলে, শুধু লাঠি হাতে কীর্ত্তিকে ধর্‌তে এমন বীর এখনও জন্মায় নি।' পাড়ার লোক স্বপ্নেও জান্‌ত না যে আমি ডাকাতের সর্দ্দার, তারা আমার পক্ষ হোলো।

তারপর দিন তিন চার পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা পেট ভরে ভাঙ খেয়েছি, এমন সময়ে একটা লোক এসে দৌড়ে খবর দিলে, কীর্ত্তি তোর ঘরে পুলিশ আস্‌ছে, সেদিন আমার কব্জীতে জোর ছিল না, লাঠি তুলতে পারলুম না, নইলে সব ব্যাটাকে এক হাত দেখে নিতুম। ব্যাটারা এসে আমার ঘরের মেঝে, রান্নাঘর, আঙ্গিনে খুঁড়ে একসা কোরে ফেল্‌লে, কিন্তু কিছুই কিছু সন্ধান পেলে না। আমি হাঁক দিয়ে বললুম, সব খুঁড়ে দেখো, কিন্তু আমার গাছ একটিও যেন নষ্ট না হয়, তা হোলেই মজা দেখাবো। বড় বড় বেগুণ গাছ গুলিতে দু চারটে তখন বেগুণ ধর্‌তে সুরু হয়েছে, তারই তিন হাত নীচুতে আমার সর্ব্বস্ব পোঁতা ছিল। ব্যাটারা মুখ চুণ করে ফিরে গেল, বুধি তো রাস্তার দাঁড়িয়ে দুষমনকে লক্ষ্য কোরে গালাগালি সুরু কর্‌লেদিল।

আমি তারপর তিন দলের লোকদের সন্ধানে গেলুম, তারা তো কেউ কবুল যায় না, তবে দেখলুম এ ওকে সন্দেহ কোরছে, এর আড়ালে এ ওর নাম কোরছে। আমি বললুম দ্যাখ, একজন ধরা পড়লেই অপর জনেরও সর্ব্বনাশ হবে, তোরা নিজের বিপদ নিজেই ডাক্‌তে গেলি ক্যান?

দু দিন পরে ফিরে এসে দেখি, আমার ঘরের সাম্‌নে লোকে লোকারণ্য, আমার আঙ্গিনায় পুলিশ সাহেব নিজে এসে লোক লাগিয়ে খোঁড়াচ্ছে, আমার বেগুণের গাছ গুলো খুঁড়িয়ে একঘড়া টাকা পেয়েছে, গাঁ উজাড় কোরে ছোট বড় সবাই ভিড় কোরে অবাক হোয়ে দেখ্‌ছে। আমি হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বন্দুক নিয়ে চারজন লোক আমায় ঘিরে ফেল্‌লে। সাহেব জিজ্ঞেস কোরলে, তুমি ডাকাতী করো? এতো টাকা তুমি কোথায় পেলে? আমি বললুম, আমায় কোনও কথা জিজ্ঞেস কোরো না। আমায় নিয়ে যা খুসী কোরতে হয় কর। পাঁচ ঘড়া টাকা বের কোরে আরও খুঁড়তে লাগ্‌লো। আর ছিল না, তা পাবে কি? বুধি আর মেয়েটা আছাড় কাছাড় কোরে কাঁদতে লাগলো, আমার চোখ দিয়ে যেন আগুণ ছুটতে লাগলো। হাতে হাত কড়ি দিয়ে আমায় থানায় নিয়ে গেল।

জেলায় চালান কোরলে, উকীল কত জেদ্‌ কোরলে, ম্যাজিষ্ট্রেট কত কথা জিজ্ঞেস কোর্‌লে, আমি সেই এক কথা বলে চললুম, আমি কিছু বোলবো না, তোমরা যা হয় আমায় নিয়ে করো। দশ বছর জেল হোলো। দশ বছর জেলে পাথর ভাঙলুম। মেয়েটার মুখ মনে পড়ে বুকের কল্‌জে যেন জ্বলে যেতো। এক একবার পালিয়ে যাব মনে কর্‌তুম, কিন্তু তা কর্‌লুম না।

পাপের শাস্তি দশবছরে যদি ক্ষমা হয় তা হোলে তাই হোক্। মনকে প্রবোধ দিয়ে দশবছর পাথর ভাঙলুম।

জেলার সাহেবের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো খেলা কোরে বেড়াত চেয়ে চেয়ে দেখতুম, মনে মনে ভাবতুম যদি আমি ওদের চাকর হোতে পেতুম, তা হোলে আশ মিটিয়ে ওদের ভালবাসতুম,—আদর যত্ন করতুম। মেয়েগুলো আমার দিকে ঘেঁসতো না। সাহেবের একটি ছেলে ছিল—তার নাম টম্। সে এক একবার চক্ষু ঘুরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কোরতো, "তোম ডাকু হ্যায় ?" আমি বলতাম "আগে ছিলুম, এখন তো আমি ডাকু না, কয়েদী।" টম্ বোলতো "তোম্ বদমাস হ্যায়।" রোজই সে আমায় ঐ রকম দু একটা কথা বোলতো। আমার কাণে তাই মিষ্টি লাগতো।

ক্রমে দশবছর শেষ হোয়ে এল। আমি আশায় ... দিন গুণতে লাগলুম, দশবছরের পর মেয়েটি আমার কত বড় হোয়েছে। সে আমায় আর চিনতে পারবে কি না, এই রকম কত কথাই মনে ... হোতে লাগলো, কিন্তু একবার এ কথা মনে হোলো না যে, সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে।" হায় রে বাপ মার মায়া!

দশবছরের পর গাঁয়ে এসে দেখলুম আমার ঘর ভেঙ্গে চুরে মাটীর ঢিপী পড়ে রয়েছে। বুঝি মরে গেছে। যে মেয়েকে দেখবার জন্য ছুটে এলুম, সে বেটিও আমায় ফাঁকী দিয়ে চোলে গেছে, তবে সবাই বোলতে লাগলো—সে রাতদিন আমার কথা বোলতো। তার ডাকাত বাপকে আর সবাই ঘেন্না কোরলেও সে সদাসর্ব্বদা বাপের নাম কোরতো, বাবা ফিরে এলে আবার বাবাকে দেখবে, এই তার বড় আশা ছিল।

সে আমার জন্যে কিছু রেখে গেছে, সে কিছু কি? একটি বছর ছয়েকের মেয়ে। পরাণ মোড়লের বাড়ীতে মেয়েটা আছে। তার মাকে তার বাপ ভাত দিত না। খুকনী গাঁয়ের লোকের ধান ভেনে নিজের আর মেয়ের পেট চালাতো। মরবার সময় গাঁয়ের লোকের হাতে ধোরে বলেছিল, আমার মেয়েকে একমুঠো ভাত কেউ দিও, একটু বড় হোলে সে কাজ কোরে খাবে, ভিক্ষে যেন কারু দুয়ারে করে না। তারপর ওর দাদা ফিরে এলে একটা কিছু গতি করবে।

আমার ছু চোখ দিয়ে জলের ধারা ছুটতে লাগলো, আমি পরাণ মোড়লের বাড়ী ছুটলুম। কানী (ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড) পরে একটি মেয়ে নাচছুয়ারে দাঁড়িয়ে মুড়ি খাচ্ছে। একি? ঠিক আমার সেই খুকনী। আমি দৌড়ে গিয়ে কোলে নিলুম মেয়েটা কিন্তু সচ্ছন্দে গলা জড়িয়ে ধোরে বললে "তুমি দাদা"? তার মা তাকে দাদার কথা এমন কোরে রোজ শোনাতো, যাতে তার ছোট্ট প্রাণটি তার দাদাকে চোখে না দেখলেও মনের মধ্যে চিনে রেখেছিল। আমি তাকে কত আদর করলুম, সে বারবার কোরে কেবল এই কথাটি বল্‌তে লাগলো, আমায় ছেড়ে তুই আর যাস্‌নি দাদা।

ছোট্ট খুকনীকে নিয়ে আবার ঘরকন্না পেতে বসলুম, এতটুকু কচি মেয়ে একেবারে আমায় যেন শত পাকে জড়িয়ে ফেললে। সে বাঁধন কাটিয়ে এক পা নড়বার আমার ক্ষমতা রইল না। আবার রোজমিস্ত্রীর কাজ কর্‌তে লাগলুম। খুকনী আমার সঙ্গে মসলার পাত্তর নিয়ে ফির্‌তে লাগল। সন্ধ্যে হোলে ছুজনে বাড়ী এসে রান্না কোরে খাই, খুকনী কুটনো কুটে দেয়, ঘর ঝাঁট দেয়, কত ভারীকী চালে কাজ করে, খেলুড়ী মেয়েরা ডাক্‌তে এলে বলে, এখন কি আমি ঘর ছেড়ে যেতে পারি? রাত্রি বেলা খাওয়া দাওয়া হোলে সে আমার কোলে বোসে বলত, দাদা, তুই ডাকাতী করতিস্? কি করে বল্‌না, দাদা শুনি। তার আগ্রহে এক একদিন বল্‌তে সুরু করতুম, সে কিন্তু শুন্‌তে না শুন্‌তেই ভয়ে আমার মুখে তার ছোট্ট হাত চাপা দিয়ে আমার বুকে মুখ লুকুতো।

এমনি কোরে আমার দিন কাট্‌তে লাগল। ছোট্ট খুকনীর বিয়ে দেবার জন্যে সবাই বল্‌তে লাগল, আমি কিন্তু তাকে বিয়ে দিয়ে থাক্‌তে পারব না, সেজন্যে সে কথা কাণে নিতুম না। বরং দেখে শুনে এর পরে, মা বাপ মরা একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে ঘর জামাই কোরে রাখব, এইটে মনে করতুম। খুকনীকে বিয়ে দিলে আমার আর রইল কি? না, না, তাকে আমি প্রাণ ধোরে পরের ঘরে যেতে দিতে পার্‌ব না। কিন্তু আমার ভাগ্যে আমার শেষ বয়সের এ সুখটুকুও রইল না, তাই খুকনী আমার চারদিকে কচি হাতে যে সব বাঁধন খুবই শক্ত করে বেঁধেছিল, নিজেই আবার সে বাঁধন কেটে দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। আমার মুক্তি হোলো, জন্মের মতন ছুটি হোলো।

কীর্ত্তির স্বর ধরিয়া আসিয়াছিল, সে থামিল। তাহার পাথরের মতন

চিত্ত দ্রব হইয়া নয়ন পথে অশ্রুধারা নামিল। চুনী ও শান্তি স্তব্ধ হইয়া কীর্ত্তির মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। কীর্ত্তির বেদনায় তাহাদের দুটি কোমল প্রাণ সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তাহাদেরও চক্ষে অশ্রু বিন্দু টল্ টল্ করিতেছিল।

একটু পরে কীর্ত্তি আবার আরম্ভ করিল। তারপর পাগলের মতন, হেথায় সেথায় ছুটে বেড়ালুম। লোকে আমার দিকে চেয়ে ইসারায় বলাবলি করত, দেখছ, হাতে হাতে কেমন পাপের শাস্তি, মাথার উপর ভগবান রয়েছেন, একি সহজ কথা!

আমার মনে হোতো, ভগবান এক চোখো; নইলে কত জনা তো কত পাপ কোরেও কেমন নাতি ব্যাটার বাপ হয়ে সুখ সম্ভোগ করছে, আমার বেলায় অমনি বুঝি ন্যায় বিচার দেখলে, বলো? কেন? আমি ঘুস্ দিতে পারিনে বলে? বছর বছর মানসিক কোরে, জোড়া পাঁঠা, মোষ এ সব বলি দিতে পারি নি বলে? আর এইবার তো আমায় সব রকমে ফকীর করেছ, আর আমার কি কেড়ে নেবে? আবার দল বাঁধবো, আবার ডাকাতী কোরবো, কি করে আমায় তোদের ভগবান হাতে হাতে আর জব্দ করেন, দেখ্‌ব।

চির দিনের সাথী এই লাঠিটাকে হাতে নিয়ে পুরনোসঙ্গী সাথীদের খোঁজে বেরুলুম, কতজনা মরে গেছে। সর্দ্দার তখন খুব বুড়ো হয়েছে। কিন্তু কোনো অভাব নেই, নাতি পুতি নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে শেষ বয়েসে হরিনাম করছে। যাই হোক্ তার সুখে আমি হিংসে করি না। শীগগীরই আবার আমার চারদিকে লোক জড় হয়ে উঠলো, কিন্তু রাত্রি বেলা স্বপ্ন দেখলুম, খুকনী এসেছে, যেমন তাকে কোলে নিতে যাব, সে ভয়ে সরে যাচ্ছে, আর বলছে তুই ডাকাত? না দাদা, তোর কোলে যেতে আমার ভয় লাগছে।

আমার মন বিগড়ে গেল, রাতারাতি দলের কাউকে কিছু না বলে সরে পড়লুম। এ-দেশ ও-দেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে তোদের এখানে এসে চাকরী নিলুম। এই বেশ আছি দিদি, তোদের নিয়ে অনেকটা আরাম পাই। ভগবানের মর্জ্জি তো বুঝতে পারলুম না, সে এক মহা খামখেয়ালী লোক, কিন্তু উপায় নেই, তার রাজত্বিতে, সে যা করছে তার উপর কথা কইতে গেলে কোনো ফল নেই। যদি কখনও সামনা সামনি হোতে পারি তাকে একবার জিজ্ঞেস করি, এ খামখেয়ালের অর্থ কি।

চুনী গম্ভীর ভাবে কহিল, তুমি তো খুব শপথ করেছ, মনে পরেও তাঁর দেখা তো পাবে না।

কীর্ত্তি—লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া কহিল "পেতেই হবে, সাধ্য কি তার, যে আমায় লুকিয়ে থাকবে, আমি তাকে একবার ধরবই দিদি, তা বেঁচেই হোক আর মোরেই হোক; আমি পাপী হই, যাই হই, তারই হাতের গড়া তো বটে।

কীর্ত্তির মুখে একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আকাশের আঙ্গিনায় দেববালাদের পদ্মহস্তে শত শত মাণিকের বাতি জ্বলিয়া উঠিয়া চারিদিকে স্নিগ্ধ দীপ্তি ছড়াইয়াছে। শরত লক্ষীর গলার শিউলী ফুলের মালার বাতাসে সন্ধ্যার বাতাস ভুরিয়া উঠিয়াছে। চুনী ও শান্তির ভাব-নিমগ্নচিত্ত এই সময় বুড়ী ঝির ডাকে চমকিয়া উঠিল। বুড়ি ঝি বলিতেছিল, "ওমা দিদিমণিরা তোমরা সব এখানে। আমি সারা মুলুক খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক গা গয়না পরে, ভর সন্ধ্যেবেলা দেউড়ীর দোরে বোসে কি হচ্ছে, তা জানিনে। যে দিন কাল পড়েছে, দু দুবার বাড়ীতে চুরী হয়ে গেল। এস এখন, মা ঠাকরুণ ডাকাডাকি করছেন।

শান্তি ও চুনী উঠিয়া দাঁড়াইল যাইতে যাইতে শান্তি কহিল, আর আমাদের বাড়ী চোর ডাকাত কেউ মাথা গলাতে পারবে না তা জানিস্ চুনী দি? কীর্ত্তি বলে, যে বাড়ীতে কীর্ত্তি লেঠেল আছে, চোর কি ডাকাতরা শুনবে, তারাদশ কোশ দুর থেকে নমস্কার কোরে পালিয়ে যাবে, সে দিকে আর এগুবে না।

শ্রীসরসীবালা বসু।

কুশদহর রক্ষার্থে অবতীর্ণ বাণী

যখন প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টির কোন অংশ ধ্বংসমুখে পতিত হয়, তখন তাহার রক্ষা মনুষ্য সাধ্যের যেন অনায়ত্ত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যদি তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজনাভাব না হইয়া থাকে, তবে তাহার ক্ষয় নিবারণ জন্য বাধিতা প্রেরিত প্রতিবিধান আসে। বিধাতার বিধান মানব-হস্ত-সিঞ্চিত

জলের স্থায় নহে—তাহা স্রোতের আকারেই আসে। যেন সকলেরই জন্য ফলশালী হয়।

আমরা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ক্লিষ্ট কুশদহবাসী মাত্রেই কুশদহর পুনর্জীবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে একরূপ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। কুশদহ রক্ষার জন্য বিধাতা কোন বিধান -ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না. এতদিন আমরা তাহারও কোন অনুধাবন করিতে পারি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার লীলা রহস্য! যাই কুশদহ-বাসীগণ সমবেত ভাবে কুশদহ রক্ষার চিন্তায় মিলিত হইতে কেবল মাত্র সঙ্কল্প-যুক্ত হইয়াছেন, অমনি তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্র প্রকাশ করিয়া ধ্বংসমুখীন সন্তান সন্ততিগণের রক্ষার জন্য তিনি বহুপূর্ব্ব হইতে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার রহস্য ভেদ করিয়া তাঁহার সেই মন্ত্রবাণী শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি গম্ভীর—সুমধুর স্বরে বলিতেছেন:—

"হে আমার কুশদহ-বাসী সন্তানগণ, আমি তোমাদের রক্ষার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতে বিধান-ব্যবস্থা করিয়াছি, তোমরাও অনেকে তাহা অনুসরণ করিয়াই এখন পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছ, কিন্তু তোমরা তাহা অনুধাবন করিতে পার নাই যে, তাহা আমারই ব্যবস্থা এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্ঞানে-সচৈতন্যে তাহারই পূর্ণতা সাধন তোমাদের করিতে হইবে।"

"তোমরা যাহারা পূর্ব্ব হইতে সপরিবারে কুশদহর বাস ছাড়িয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে—সহরে, প্রবাসে আসিয়া, স্বাস্থ্য, ধনে, বিদ্যায়, উন্নত হইয়াছ—হইতেছ, তাহারাই আপনাপন ব্যক্তিগত জীবন বাঁচাইয়া জন্মভূমির নাম রক্ষা করিয়াছ। আজ তোমরাও যদি ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিতে তবে তোমাদের দশাও ঐ [illegible] হইত না কি? অতএব এক্ষণে যাহাতে তোমাদের [illegible] এখনও ভাল স্থানে আসিয়া তোমাদের স্থায় আত্মরক্ষা করিয়া উন্নত হইতে পারিতেছে না; পল্লীতেই দিনের পর দিন ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট দেহ লইয়া ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে, তজ্জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভাল স্থানে আসিয়া বাস করিতে, উৎসাহিত এবং [illegible] কর।"

"তোমরা যাহারা কল্পনা বশতঃ, [illegible], দেশ ছাড়িয়া যেন অন্যায় করিয়াছ, এবং তজ্জন্যই গ্রাম [illegible] ও শ্রীহীন হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, উহা ভালই করিয়াছ, উহাতেই দেশ রক্ষা হইয়াছে।"

"দ্বিতীয় যাহারা একান্তই দেশ ছাড়িয়া আসিতে পারিতেছেন, তাঁহাদের

মঙ্গলের জন্য এবং তোমাদের বংশাবলীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তোমাদের পল্লীর পরিত্যক্ত গৃহাবলী ও নিবিড় জঙ্গলাবৃত বাগানগুলি পরিষ্কার কর। তাহাতে প্রাকৃতিক নিয়মেই নষ্ট স্বাস্থ্যের উদ্ধারের পথ পরিস্কার হইবে। তোমাদেরও তাহাতে আবার দেশের প্রতি আকর্ষণ হইবে।"

"বাসস্থানের বাগানের সম্পূর্ণ আকার নূতন কর। নূতন স্থানে নূতন ফল-মূলাদিযুক্ত ক্ষেত্র কর। সাধ্যানুসারে সকলে তন্মধ্যে এক একটি পানীয় জলের ইঁদারা কিম্বা পুষ্করিণী কর।"

"তৃতীয়; যাহারা দেশের কৃষক—যাহারা তোমাদের অন্ন যোগায়, তাহাদের প্রতিও ভালবাসার কাজ কর। প্রথমতঃ তাহাদের নিরক্ষরতা দূরের জন্য গ্রামে গ্রামে—পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা (নৈশ বিদ্যালয়) কর। তৎপরে অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধন করিতে চেষ্টা কর।"

"সমস্ত কুশদহবাসীর একতা স্থাপন দ্বারা এই সকল কার্য্য ও ভবিষ্যৎ বংশকে বলে ও চরিত্রে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইবার জন্য গঠন কর"।

"কুশদহ রক্ষার জন্য ইহাই আমার আদেশ। ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই জানিবে। ইহাই মূল ভাব জানিবে। বিশেষ বিশেষ ভাব থাকিলেই কার্য্যক্ষেত্রে আপনাপন হৃদয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইবে। মূল লক্ষ্য রাখিবে, দেশ রক্ষার জন্য সকলে প্রেমে মিলিত হও। ব্যক্তিগত ভাবেও প্রত্যেকে সুখী ও পুষ্ট হইবে। এই সত্য তোমাদের মধ্যে প্রতিভাত হইয়া, কেবল কুশদহবাসীর রক্ষার উপায় হইবে তাহা নহে, সকল পল্লীর রক্ষার্থেও এই প্রণালী গৃহীত হইবে। এক্ষণে যাঁহারা এই সত্য গ্রহণ করিতে পারিবেনা—প্রতিবাদ, অবিশ্বাসও করিবেন, তাহারাও পরে বুঝিতে পারিবে।"

ভগবদ্বাণী, মানবভাষার মধ্যদিয়া বর্ণিত হওয়ায় তাহাতে যে কোন অপূর্ণতা ত্রুটি না থাকে তাহা নহে; কিন্তু প্রত্যেকের অন্তরে উহা পূর্ণতা লাভ করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। আবার কালে মূলভাব হইতে মানববংশ যখন সরিয়া পড়িতে থাকে তখন তাহাতে বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

—:০:—

জগদ্ব্যাপী শান্তি—মানবের আত্যান্তিক "দুঃখ নিবৃত্তি" জানে, ইহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যাপার। সেই অবস্থা হইতে পৃথিবী এখনও বহু দূরে। তৎপরে মানবে মানবে প্রেমে—সদ্ভাবেও এক প্রকার শান্তি রাজ্য আছে। বিবাদ বিদ্বেষ যুদ্ধবিগ্রহে এই রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। জগতের স্রষ্টা মঙ্গলময়। মানবের যত কিছু মানবীয় মনবৃত্তি আছে তদ্বারা মানব কখন সুখ কখন দুঃখ ভোগ করিতেছে, কিন্তু বিধাতা ব্যক্তিগত জীবনে বা সমষ্টিগত জীবনে সকল ঘটনার মধ্য হইতে জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। মানব পাপ করিয়া শাস্তি পায় তাহা মঙ্গলের জন্য। যাহা হউক এ সকল কথায় জন সাধারণের একপ্রকার মোটামুটী বিশ্বাস আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতেই সমস্ত মানবের পক্ষে এক শান্তিরাজ্য আসিবে। এই সত্যে বোধ হয় জগতের সকল লোকের স্থির বিশ্বাস নাই। জাগতিক মানবের অবস্থা দেখিয়া এ প্রকার বিশ্বাস না থাকারও অবশ্য কারণ আছে। তবে মানব-চিত্ত স্বভাবতই বিশ্বাসী, আজ আমার যে বিশ্বাস নাই, কল্য তাহা আসিতে পারে।

এই প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের শেষ ফল যে মঙ্গলে পরিণত হইবে, এ বিশ্বাসে কেবল সাধারণের মধ্যে নয়, অনেক জ্ঞানী বিদ্বান লোকের মনেও সন্দেহ আসিয়াছিল। ন্যায় সত্যের জয় হইবেই এ কথা মৌখিক স্বীকার করিয়াও ন্যায় সত্যের নির্ব্বাচনে সকল মানুষের জ্ঞান বিশ্বাস সমান দেখা যায় না। মঙ্গলময় ঈশ্বরের স্বরূপে স্থির বিশ্বাস না থাকিলে সত্য দৃষ্টি লাভ করা যায় না। জগত-ব্যাপী মঙ্গলের রাজ্য আসিবে এ বিশ্বাসও বিধাতার মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাসের ফল মাত্র। মহাযুদ্ধে পৃথিবীর এত পাপ ক্ষয় হইল, যত সত্যের দৃষ্টি জাগিল—তাহার একমাত্র কারণ বিধাতা মঙ্গলময়।

কৃতজ্ঞতা দান—জগতে ওতপ্রত ভাবে নিরন্তর বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু মানুষ তজ্জন্য চমকিত হয় না, চমকিত হয় তখন যখন প্রবল ঝটিকা প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। মঙ্গলময় বিধাতা অবিরাম অশেষরূপে জীবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ আমরা তাহা দেখি না। তবে যখন বিশেষ কোন অনুকূল ঘটনা ঘটে, তখন হয়ত একটু আধটু অনুভব

করি। বিশ্বাসী ভক্তগণ ভগবানের করুণা অনুক্ষণ অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হন। সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতা মোহ বশতঃ নিয়ত নিজ কামনা স্রোতে ভাসিয়া থাকে। কামনাই যে দুঃখের কারণ—যতদিন দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার না হয়, ততদিন শতবার দুঃখ ভোগ করিয়াও সে কথা মানুষ বুঝিতে পারে না, তাই সংসার সর্ব্বদাই দুঃখ ময় বোধ হয়। এই দুঃখ অশান্তি ভোগ করিতে করিতে ভগবানকে মঙ্গলময় বলিয়া বিশ্বাস করা অজ্ঞানী মানুষের পক্ষে কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানীর নিকট তাহা হয় না—মরণ-বৃষ্টি মঙ্গলময় হইতে তাঁহারা লাভ করেন।

আজ যুদ্ধ নিবৃত্তিতে যে ঘটনা ঘটিল—পৃথিবী রক্ষা হইল—কখন কি হয় ভাবিয়া লোকের মনে যে আশঙ্কা ছিল—দিনের পর দিন নূতন নূতন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছিল—সর্ব্বোপরি রক্তস্রোতে ধরণী প্লাবিত হইতেছিল, তাহার নিবৃত্তি হইল। চারিবৎসর যুদ্ধে মানুষের মন কত কঠিন হইয়া গিয়াছিল, প্রতিদিন সহস্র সহস্র মানব-জীবনের ক্ষয়ে আমরা এতটুকুও যেন কষ্ট বোধ করিতাম না। কিন্তু আজ সহসা অভাবনীয় রূপে দাম্ভিকের পরাভব ঘটিল। চিন্তাশীল মানব-হৃদয় আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভগবানের করুণা স্মরণ করিতেছেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া ভগবানের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছেন, মাতৃভূমির সেবকগণ আশার চক্ষে ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতি বর্ত্তমানেই বিশ্বাসচক্ষে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেছেন। উদারহৃদয় মনীষীবৃন্দ ভবিষ্যৎ জগতে এক অভিনব সাম্য রাজ্যের সূচনায় কত আশা করিতেছেন। ধন্য বিধাতার বিধান, আজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া ধন্য হই।

কুশদহ-সমিতি

(প্রাপ্ত)

(বস্ত্র বিতরণ কার্য্যবিবরণী)

এই দীর্ঘ অবকাশ কালে সমিতির কি কি কাজ হইল তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। ৺পূজার অবকাশে সমিতি বস্ত্র বিতরণ কার্য্যেই এক প্রকার ব্যাপৃত ছিলেন। এই মহৎ কার্য্যে সমিতি যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন গত মাসের কার্য্য বিবরণী হইতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। অতঃপর

সমিতি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই বস্ত্রভাণ্ডারে সাহায্য করিয়াছেন তন্মধ্যে টাকী নিবাসী পরদুঃখ কাতর শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারই উৎসাহে সমিতি এই কার্য্যে বিশেষ শক্তি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি এককালিন একশত টাকা বস্ত্রভাণ্ডারে দান করিয়া গরীব মাতৃ জাতির লজ্জানিবারণ ক্লেশ দূরের জন্য যেটুকু চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতেই যে পরমমাতার আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ দান সংগ্রহ হইবে তাহা অনেকেরই হয়ত মনে হয় নাই; কারণ "শুভ যার ইচ্ছা, ঈশ্বর তার সহায়" এ কথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দাতৃগণের প্রতি নমস্কার জানাইয়া তাঁহাদের দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

নাম	নিবাস	কলিকাতার ঠিকানা	পরিমাণ
স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু	...	সুকিয়া ষ্ট্রীট	২৫
রায় বাহাদুর হরিরাম গোএনকা	...	বড়বাজার	২৫
শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী	...	দর্জ্জিপাড়া	১৫
,, নফরচন্দ্র নন্দী	...	,,	১৫
,, নরেন্দ্রনাথ পাল	...	সুকিয়া ষ্ট্রীট	২
,, হৃদয়কৃষ্ণ দে বি, এ, (প্রফেসর)	...	মেট্রপলিটান কঃ	১
নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মাঃ শ্রীনাথ দত্ত	...	কলিকাতা	১০
হাকিম মাসীহর রহমন সাহেব (বেগম বাহার)	হৃদয়পুর	চিৎপুর রোড	৫
শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল	টাকী	পটলডাঙ্গা	১০০
ষ্টেট ৺ মহানন্দ দাস— মাঃ সুরেন্দ্রনাথ ও খগেন্দ্রনাথ পাল	,,	আহিরিটোলা	২৫
শ্রীযুক্ত কুশচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	,,	বড়বাজার	১০
,, মহামূল্য আশ	,,	,,	১০
,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য— (৺সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র)	,,	নন্দরাম সেনের গলি	
,, খগেন্দ্রনাথ পাল	হৃদয়দাদপুর	বাগবাজার	১০
,, শিবদাস রক্ষিত	,,	বড়বাজার	

,, সুবোধচন্দ্র কুণ্ডু ১২৩	গোবরডাঙ্গা, রামবাগান		১০৲
,, কুমুদবিহারী রায়	খাঁটুরা-'মঙ্গলালয়' কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট		৫৲
,, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ইছাপুর	টালা	
,, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল	,,	,,	
,, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,	,,	
,, যতীন্দ্রমোহন মিত্র	সৈপুর	হেমকরের লেন	

মারফতে সম্পাদক, বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকগণ দ্বারা

কয়েকটি চিত্তরঞ্জকলেজের আদায় ১নং নং ৫নং বহি— মোট--২২৸৵০

৩১১৸৵০

ব্যয়

কাপড় খরিদ। ১০ হাত ৪৬ ইঞ্চি ২১ থান, ৮৪ খানা ৫৸০ হিঃ— ১১০৲
ধুতি ৯ হাত ৩৯ ইঞ্চি ৫০ জোড়া ৩৷৵০ হিঃ—১৬৭৸৵০ মধ্যে ১৬৩৸৵০

২৮৩৸৵০

গাড়ী ভাড়া, ষ্টীম ভাড়া ও কাপড় খাঁটুরায় পাঠান লগেজ
মুটে ইত্যাদি খরচ ৬৸৴১০

পুনরায় খরিদ

১২ খানা ধুতি ও থান মোট— ১৪৸৵০
ট্রাম ভাড়া— ৵১০

মোট ৩০৫৸/০

মৌজুত—৬৵০ আনা সমিতির সম্পাদকের হস্তে সমিতির তহবিলে দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে বস্ত্র বিতরণের বিবরণী ছাপা হইবে এবং ডাক মাশুল দিয়া সকল সভা ও বস্ত্র ভাণ্ডারে দাতৃগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

গোবরডাঙ্গা, গয়েদাদপুর, খাঁটুরা, জামদানি, ত্রিপুল, দেওড়া, বেড়গুম, জানাপুল, গ্ৰা গাছি, ধর্ম্মপুর, ইছাপুর, ভদ্রডাঙ্গা, বেলিনি মাঠকোমরা, লোকপুর, দেবীপুর প্রভৃতি ২১খানি গ্রামে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অর্থ সংগ্রহ হইতে, প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে প্রকৃত বস্ত্রাভাব গ্রস্ত গৃহস্থদিগের তালিকা সংগ্রহ এবং বস্ত্র খরিদ, বস্ত্র বিতরণ পর্য্যন্ত কার্য্যের সমস্ত ব্যবস্থা ও কার্য্য নির্ব্বাহার্থে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল, যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সুরেন্দ্রনাথ পাল, মাসের কার্য্য বিবরণী হইতে জ্ঞ, শীলাচল মুখোপাধ্যায়, নিশিভূষণ মুখো-

পাধ্যায়, "দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণকে লইয়া একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তি বিশেষের নিকটও পত্র লেখা হইয়া ছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বেড়গুম, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষপুর, মহাশয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য। বস্ত্রভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ উৎসাহশীল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল ও সমিতির চিরানুগত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় বস্ত্র ক্রয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এই মাহার্ঘ বাজারে তাঁহারা অনেক সুবিধায় কাপড় সংগ্রহ করিতে পারিয়া ছিলেন।

২৮শে আশ্বিন নবমী পূজার প্রাতে গৈপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটিতে সাবকমিটীর এক অধিবেশন হয়। তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংগৃহীত, অভাবগ্রস্তগণের নামের তালিকা নির্ব্বাচনানুসারে মোট ১৮৪ খানা বস্ত্রের মধ্য হইতে ১৩৯ খানা কাপড় দেওয়া ধার্য্য হয়।

ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল শ্রীযুক্ত নীলাচল মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রভৃতি মহাশয়গণ খাঁটুরা অঞ্চলে বিপুল দেওড়া প্রভৃতি গ্রামে বস্ত্র দিয়া মেদে হইতে নৌকা যোগে রাত্রে খাঁটুরায় আসেন। গৈপুর হইতে ঐ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামের বস্ত্রগুলি, তার প্রাপ্ত সভ্যগণের দ্বারা বিতরণকার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

এই কার্য্যে যাঁহারা স্বচক্ষে গৃহীতাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছেন, তাহাদের প্রেরিত মন্তব্য পাঠ করিলে বস্ত্র বিতরণ কার্য্য কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ঐ সকল মন্তব্য স্বতন্ত্র মুদ্রিত বস্ত্র বিতরণ কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে।

অতঃপর বস্ত্র সাবকমিটার কলিকাতায় আর একটি অধিবেশন হয়, তাহাতে পুনরায় প্রাপ্ত নামের তালিকানুসারে উদ্বৃত্ত ৪৫খানি ও মৌজুত অর্থ হইতে আরো ১২খানি বস্ত্র খরিদ করিয়া তালিকা প্রেরক মহাশয়গণের দ্বারা দেওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীগিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়,
সহঃ সম্পাদক।

কুশদহ-পঞ্জী

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ

সৈপুর।

(চারু বাবুর সংগৃহীত পুথি হইতে লিখিত)

শ্রীহর্ষের ঊনিশ পুরুষের অধস্তন বিখ্যাত কামদেব পণ্ডিতের সন্তান এগার জন। এই ১১ জনের মধ্যে মধুসূদন আচার্য্যের দুই পুত্র—অনন্ত ও সন্তোষ। চুঁচড়ার কৃতীসন্তান বিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই সন্তোষের ধারা হইতে উৎপন্ন। অনন্তের দুই পুত্র—শ্রীকান্ত বিদ্যানন্দ ও ভবানী বিদ্যালঙ্কার। শ্রীকান্তের ধারা এই কুশদহে দেখা যায়। শ্রীকান্তের সাত পুত্র। তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্র খুলনার অন্তর্গত হরিদাস গ্রাম হইতে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। উক্ত রামচন্দ্রের তিনপুত্র কাশীশ্বর, গোপাল (ভঙ্গ) ও গোবিন্দ। গোপালের পাঁচ পুত্র। ইঁহার দুই পুত্র গোবরডাঙ্গা হইতে নদিয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটের নিকট মধ্যমগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইঁহারা উক্ত গ্রামের ও ত্রিকবেণী গ্রামের জমিদার। এই জমিদার বংশে গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র, রুদ্র ও মহাদেব। এই রুদ্রের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত রামদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় যশোহর মাজিষ্ট্রেটের সেরিস্তাদার ছিলেন। পেন্সন লইয়া এক্ষণে চাঁচড়ার রাজষ্টেটের ম্যানেজার। এই রামদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জামাতা শ্রীমান শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সবরেজিষ্ট্রারী করেন। উপরোক্ত ভঙ্গ গোপালের ৫ পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র গোবরডাঙ্গায় থাকেন। এই গোপালের পৌত্র বিনোদ বিদ্যানিবাস বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ঐ বিদ্যানিবাসের ধারায় গোবরডাঙ্গায় রূপচন্দ্র, হরি ও নারায়ণ।

গোপালের ভ্রাতা কাশীশ্বরের ১১ পুত্র। তন্মধ্যে অনেকেই নিঃসন্তান। কাশীশ্বরের পুত্র খেলারামের তিন পুত্র—কন্দর্প বিদ্যাবাগীশ, সন্তোষ ন্যায়ালঙ্কার ও প্রাণবল্লভ বিদ্যারত্ন। কন্দর্প বিদ্যাবাগীশের ও সন্তোষের সন্তানেরা ঝ্যাড়গাছী ও কুদমবেড়িয়াতে বাস করেন। প্রাণবল্লভ বিদ্যারত্নের বংশ গোবরডাঙ্গায় থাকেন। এই বংশের স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। গোপাল মুখোপাধ্যায়ের পত্নী সৈপুরে ৺বেণী ... কাব্য বিবরণী হইতে ... কন্যা। গোপালের ভ্রাতা যদুর পুত্র সুবো

গোবরডাঙ্গায় জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্যের জামাতা ... স্ত্রী গণপতি বংশীয় নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা হাজরাদাসী দেবী। গোপালের দুই পুত্র শ্রীকালীপদ (সন্তু) ও শ্রীপ্রফুল্ল। কালীপদর (...) দুই বিবাহ। ১ম বিবাহ চাঁদায়, ২য় বিবাহ ঘাটবামড় অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত। প্রফুল্লের বিবাহ খাটুরায় শ্রীযুক্ত সনাতন ভট্টাচার্য্যের ভাই ঝির সহিত।

উপরোক্ত রামচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র গোবিন্দের তিন পুত্র—রামবল্লভ, কৃষ্ণরাম ও রামনারায়ণ। রামবল্লভ কুশদহের বিখ্যাত কুলীনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। এই চাঁদ ...র বংশ গৈপুরের দক্ষিণ পাড়ায়, যশোহর জেলার সামন্ত গ্রামে ও খুলনা জেলার পির জঙ্গে দেখা যায়। উক্ত জগদীশ্বরীর রূপরাম ও বিষ্ণুরাম নামে দুই পুত্র ছিলেন।

রামবল্লভের ভ্রাতা রামনারায়ণের পুত্র নিধিরাম, ইছাপুরে রামজয় চৌধুরীর কন্যা ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন। নিধিরামের পুত্র তারাচাঁদ, তারাচাঁদের পুত্র আনন্দচন্দ্র একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এবং গোবরডাঙ্গায় জমিদার কালীপ্রসন্ন বাবুর সভাপণ্ডিত ছিলেন। আনন্দের দুই পুত্র দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের পুত্র স্বর্গীয় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। ইঁহার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ গয়েশপুরের কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত। এই স্ত্রীর পুত্র শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গায় জমিদার বাড়ীতে চাকরী করেন। দ্বিতীয় বিবাহ গৈপুরে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত। এই স্ত্রীর পুত্র শ্রীমান প্রমথ। ইনিও উক্ত জমিদারের সরকারে কাজ করেন।

রামবল্লভের ২য় ভ্রাতা কৃষ্ণরামের বংশাবলী গোবরডাঙ্গায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জগদীশ্বরীর যে দুই পুত্রের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপরাম কুল ভঙ্গ করেন। এই রূপরামের তিন পুত্র কৃপারাম, বলরাম ও রামেশ্বর। রূপরামের বিবাহ বেড়গুমের ...গের গাঙ্গুলী প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত। প্রাণকৃষ্ণ নিজে ... ব্যয়দের বাড়ী ভঙ্গ হয়, তৎকালে স্বকৃতভঙ্গ নয়বংশীয় রামদেব বন্দ্যো... ...শীয় রামানন্দ চট্টোর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

রূপরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃপারামের দুই বিবা

চক্রবর্ত্তী দিগের বাড়ীতে ... মণির সহিত, ২য় বিবাহ গঙ্গাপার চট্টো বংশে। কৃপারামের ৭ পুত্র, ১ম নন্দকুমার ২য় রামমোহন, ৩য় রাজচন্দ্র ৪র্থ কৃষ্ণমোহন, ৫ম রাজীবলোচন ৬ষ্ঠ নীলমণি ৭ম ঈশ্বরচন্দ্র।

১ম পুত্র নন্দকুমারের পৌত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্তের পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজচন্দ্র, রামমোহন ও নীলমণি নিঃসন্তান ছিলেন। ৪র্থ পুত্র কৃষ্ণমোহনের বিবাহ গৈপুরে লম্ব বন্দ্যো বংশীয় ৺কাশীনাথ বন্দ্যোর কন্যা আন্নাকালী দেবীর সহিত হয়। তৎপুত্র ৺উমেশচন্দ্র। ইনি সাহিত্যিক ছিলেন। উমেশচন্দ্রের বিবাহ মদনপুরে হয়।

ইহার দুই পুত্র শ্রীষষ্ঠীবর ও ৺হারাণচন্দ্র। ষষ্ঠীবর বাবু গোবরডাঙ্গার মধ্যম সরকারের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। ইহার বিবাহ বেড়গুমের কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর সহিত। ৺হারাণচন্দ্রের বিবাহ চাল্‌কীতে হয়।

কৃপারামের ৫ম পুত্র রাজীবলোচনের একমাত্র কন্যার বিবাহ খুলনা জেলার অন্তর্গত শোভনাগ্রামের চট্টো বংশে হয়। রাজীবলোচনের দৌহিত্র ৺বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন।

৭ম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র (চারুবাবুর পিতামহ) গোবরডাঙ্গা হইতে টাকী বাস করেন। ইহার পত্নী গৈপুরে গঙ্গাপতি বংশীয় রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা নৃত্যকালী দেবী। এই বিবাহের পর ইনি গৈপুরে আসিয়া বাস করেন। ইনি বারাশাতের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রাণ বাঁচাইয়া তাঁহার নিকট সম্মানিত হন।

ইঁহার দুই পুত্র—শরৎচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের পত্নী গৈপুরে ৺রামধন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা লক্ষ্মীমণি দেবী।

প্রকাশের তিন বিবাহ, ১ম পত্নী ইছাপুরের ৺ইচ্ছে ... বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা সয়মণি দেবী। ২য় গৈপুরে ৺...নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা ক্ষেত্রমণি দেবী। ৩য় খুলনা ...পাড়া গ্রামের ৺পিয়ারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হয়। প্রকাশের একমাত্র কন্যা জ্ঞানদা সুন্দরী দেবী।

শরৎচন্দ্রের দুই পুত্র—শ্রীচারুচন্দ্র ও শ্রীহরিদাস। চারু বাবুর তিন বিবাহ—

১ম—পারমাজদিয়া ... ৺...রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা মৃতা ...

২য়—ধর্ম্মপুর ... শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২য় কন্যা মৃতা

৩য়—বেড়গুম নিবাসী ৺হারাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ৪র্থ কন্যা মৃতা সরলাবালা দেবী।

৩য় বিবাহের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমান সচ্চিদানন্দ। কন্যা শ্রীমতী পুষ্পবালা দেবীর বিবাহ ঘাটভোগ নিবাসী ৺পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৩য় পুত্র শ্রীমান গিরিজাপ্রসন্নের সহিত। ২য় কন্যা বীণাপাণি (অবিবাহিতা) চারু বাবু বনগ্রাম হাই স্কুলের হেড মাষ্টার। তাঁহার প্রণীত "কালিদাস" পুস্তকে তাঁহার রচনার মাধুর্য্য প্রকাশিত আছে। হরিদাস বাবুর দুই বিবাহ।

১ম খাটুরা নিবাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ১মা কন্যা মৃতা [illegible] দেবী।

২য়—নদিয়া দেবগ্রাম হাটগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকমল চট্টোপাধ্যায়ের ১ম কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সহিত।

১মা স্ত্রী মলিনার [illegible] পুত্র—শ্রীমান নয়নানন্দ ও শ্রীমান জ্ঞানানন্দ। একটি কন্যা শ্রীমতি বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর বিবাহ বড়িষা নিবাসী ৺[illegible]রাম গঙ্গোর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত। ২য় পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর একটি পুত্র শ্রীমান রণজয়।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ।

—:০:—

এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সমর-জ্বরের প্রভাব খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি কুশদহ অঞ্চলেও কম নহে। অনেক নরনারীর এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গৈপুর নিবাসী—রাঁচি প্রবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র অলোকনাথ, ২ দিনের জ্বরে গত ১৩শে আশ্বিন বিজয়া দশমীর প্রাতে সাকৃচিতে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন. আলোকনাথ টাটার লৌহখনির রাসায়নিক পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বহু গুণান্বিত,অমায়িক যুবক ছিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যার সহিত অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছিল, একটি মাত্র শিশু পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। বসু মহাশয়ের এই দারুণ শোকের সান্ত্বনাবাণী যেন আমাদের বচনাতীত বলিয়া মনে হইতেছে বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জামাতা রজতনাথের শোকে তাঁহার হৃদয় জীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তবে তিনি জ্ঞানী পুরুষ, মনে [illegible] কোন রকমে মনস্থির করিলেও করিতে পারিবেন, কিন্তু শোকাতুরা জননী [illegible] নবে [illegible] ভাবিলে বাস্তবিক হৃদয় আকুল হইয়া পড়ে। [illegible] যে, দুর্ব্বলসন্তানের প্রতি জননীর দৃষ্টি যেমন সর্ব্বে[illegible] পরম জননীর কৃপাও যেন অধিক। তিনিই সক[illegible]

প্রবাদবাক্য আছে, "কালের প্রভাব মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না।" কালের কোন প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় না. বংশ পরম্পরা মানব মনের চিন্তাপ্রবাহ—জ্ঞান ভাব, আকাঙ্খাদি যোগে কালের গতি নির্ণয় হয় ; ফলতঃ মানবচিত্তই কালের উপর প্রভাব বিস্তার করে. কাল তাহার সাক্ষী স্বরূপ। আমরা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্থানে স্থানে আমোদ প্রমোদ উদ্দেশ্যে 'বারোইয়ারি" দেখিয়াছি. কিন্তু গ্রামের দশজনে মিলিয়া দুর্গোৎসব করা তখন ছিল না। ইহা অল্পকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে কুশদহে এই প্রণালীর পূজা এক আদ খানি করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। গৈপুর, মাটকোমরা এইরূপ সম্মিলনী পূজা হয়। ... র গোবরডাঙ্গার ঘটকপাড়ায় আর একখানি নূতন আরম্ভ হইয়াছে। বিবিধ উপলক্ষে ভারতবাসী—বঙ্গবাসী মিলিতভাবে যতই সকল কাজ করিতে চেষ্টা করেন ততই ভাল। তাছাড়া ... দত্ত বাটী, রক্ষিত বাটী, গোবরডাঙ্গার মধ্যম তরফ জমিদার বাটী ও গৈপুর ... যুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয়ের বাটীতে শারদীয় দুর্গোৎসব হইয়াছিল, তবে ব্রজ বাবুর বাটীতে ধূম ধাম অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান করুন তাঁহার সৎকাজে প্রবৃত্তির অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, কুশদহ-সমিতি ক্ষুদ্র আয়োজনের মধ্যেও এবার পূজার অবকাশ কালে কুশদহের প্রায় ২১।২২ খানি গ্রামে নিঃস্ব গৃহস্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্য তিন শতাধিক টাকার বস্ত্র বিতরণ করিয়া দান কার্য্যে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন গৈপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয়ও অনেক বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন। আর গৈপুর নিবাসী কাশ্মীরের এসিঃ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একশত টাকার বস্ত্র গ্রামবাসীদিগের মধ্যে বিতরণ জন্য টাকা পাঠাইয়াছিলেন। কাঙ্গালের ঠাকুর—দুঃখীর বন্ধু ভগবান, দাতৃগণের অন্তরে আশীর্ব্বাদের সুকোমল স্পর্শ দান করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পূজার অবকাশের পর ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর প্রভৃতি কারণে ছাপাখানার কার্য্য বন্ধ থাকায়, কাজেও করা ফর্ম্মা ছাপা হইতে পারে নাই, এই প্রেস-বিভ্রাটে পড়িয়া কার্ত্তিক সংখ্যা বাহির হইতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া একত্রে অগ্রহায়ণ, পৌষ সংখ্যা "কুশদহ" ২০শে পৌষ নাগাত বাহির করিতে হইবে। ... জন্য গ্রাহকগণ ব্যস্ত হইবেন না। অপর সংখ্যাগুলি ঠিক মত পাইবেন।

২য়—ধর্ম্মপুর ... চন্দ্র

কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড
সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।